BNG-202 উনিশ-বিশ শতকের কাব্য কবিতা পাঠ

Feb 2020 G.G

ক্রন্দসী কাব্য গ্রন্থ

ক. উটপাখী

-- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকোবে? ধূ-ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।

প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।।

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার, চলো
যে-কোনো নিভৃত কন্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অনন্ত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।।
কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবো না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনবো না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে;
উধাও তাহার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজবো না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাবো না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়াজুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় সে উন্‌তিরিশে।।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু-জনে সমান অংশীদার

অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চল আমাকে লোকোত্তরে
তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি।।

২২ অক্টোবর ১৯৩৪।

সাধারণ আলোচনাঃ (তথ্য উত্তরাধিকার ৭১ নিউজ ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ ২০২০, ৯ চৈত্র ১৪২৬)

কবি সুধীন্দ্রনাথ

"অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মনীষা, অধ্যয়ন ও কল্পনার মিথস্ক্রিয়ায় সৃজিত হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃজনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পূর্বশর্ত শৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসারে, মহাবিশ্বে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পেছনে নক্ষত্রের বিশৃঙ্খলাই দায়ী।

কোনো সুচিন্তিত প্রপক্রিয়ার ফলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে না। সৃষ্টিশীলতার যেকোনো প্রপঞ্চের ক্ষেত্রেও ওই সূত্র আংশিক সত্য। কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভিন্ন স্বকপোলকল্পিত বিষয়কে সব সময় কবিতা করে তুলতে পারেন না। যিনি পারেন তিনি হৃদয়বৃত্তির কাছে যেমন সৎ নন, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। যে কবির অভিজ্ঞার ভাণ্ডার বিচিত্রমুখী, অনেকান্ত ঘটনার যিনি গভীর পর্যবেক্ষক, তাঁর পক্ষে কেবল স্বকপোলকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। পাঠ ও যাপিত-জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁকে প্রাজ্ঞ করে তুলেছে, কল্পনা যাঁকে করেছে কবি, তাঁর কবিতায় বুদ্ধির দীপ্তি এবং মনীষার ছাপ থাকবেই। ব্যক্তি তাঁর অভিজ্ঞার বাইরের গিয়ে কেবল কল্পনায় ভর করে প্রকাশ করতে পারে না। অত্যল্প পাঠের ওপর নির্ভর করে কবি কল্পনা-প্রবণ হয়ে উঠতে পারেন কিন্তু বিপুল পঠন-পাঠনে যিনি নিজেকে ঋদ্ধ করে তুলেছেন, তাঁর পক্ষে যুক্তিহীন কল্পনার স্রোতে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে হতে হয় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ক। একই সঙ্গে ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম ও সমাজ সচেতনও। আধুনিক যুগের জটিল পরিস্থিতির ভেতর বসবাস করে সময়ের জটিল আবর্তন শনাক্ত করাও তাঁর দায়।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর কবিতায় আবেগের চেয়ে প্রজ্ঞা,

কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতা এবং ভাবালুতার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহুল পরিমাণে বিধৃত। ফলে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। এর কারণ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানস্থ হওয়া এবং কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও ভাবনা প্রকাশের বাহন করে তোলা। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্য সংগ্রহ'র ভূমিকায় লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো বলে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো বলে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন__ যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো__ যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে__ সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, ''পরিশ্রমী হও।'' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।' শিক্ষা ও রুচিবোধ যাঁকে মার্জিত ও আবেগের সংহতি দিয়েছে, তাঁর পক্ষে প্রগলভতায় ভেসে যাওয়া দুরূহ। সুধীন দত্তের কবিতায় এমন এক মার্জিত রুচির প্রলেপ ছড়ানো যাকে দুর্বোধ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না, সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাতে হয়। এ কথা সত্য__ তাঁর কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রীতিপূর্ণ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; যা গড়ে ওঠে দীক্ষিত পাঠকের ক্ষেত্রে।

প্রবুদ্ধি ও হৃদয়াকুতি__ এ দুয়ের মিথস্ক্রিয়ায় যে কবিতার সৃষ্টি, সে কবিতা পাঠকের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে না কিন্তু চিন্তা জগতে সসুক্ষ্ম অভিঘাত সৃষ্টি করে। তাঁর কবিতা বিশেষভাবে পূর্বকল্পিত সৃষ্টি; কোনোভাবেই আকস্মিক ঘটনা কিংবা তাৎক্ষণিক অনুভূতির তরল প্রকাশ নয়। 'কবিতার নির্মাণ : সুধীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অশ্রুকুমার শিকদার উল্লেখ করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন উদ্ভিদের অচিন্তিতপূর্ব নিয়মে সম্পাদিত হয় না। তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি স্থাপত্যের মতো পূর্বপরিকল্পিত। বাস্তুশিল্পী যেমন ব্লুপ্রিন্ট বা নকশা তৈরি করে তারপর সৌধনির্মাণে হাত দেন, তেমনি এই কবির প্রতিটি কবিতার পিছনে আমরা এক পূর্বকল্পনা বা নকশার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইটের মতো শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার এক একটি স্তবক। ন্যায়ের পরম্পরায় সেই স্তবকগুলি সাজিয়ে নির্মিত হয় তাঁর এক একটি কবিতা। কবিতাগুলি যেন সঙ্গীত বেদনায় মুখর এক একটি কক্ষ। অনেকগুলি কবিতা নিয়ে এক-একটি কাব্যসংকলন-যেন এক-একটি মহাল। সেই সব মহাল নিয়ে এই মহিমাময় কাব্যের সৌধ।' অশ্রুকুমার সিকদারের এই মূল্যায়ন যথার্থ; কিন্তু ইটের মতো শব্দ সাজিয়ে নির্মাণের যে অভিমত, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এ কথা মেনে নিলে সুধীন্দ্রনাথকে কবিতা বিনির্মাণকলার একজন কৌশলী বলেই মনে হয় এবং প্রকৃত কবির যে বৈশিষ্ট্য ও অভিধা, তা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সুধীন দত্ত কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে প্রজ্ঞার স্মারক করে তুলেছেন। চিন্তাশূন্য কল্পনাবিলাসিতার বিপরীতে অবস্থা নিয়েছে তাঁর কবিতা। সঙ্গত কারণে অপ্রস্তুত পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার

রস আস্বাদন অনায়াস-সাধ্য নয়। একথা অস্বীকার যায় না__ তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মিথ ও পাণ্ডিত্যের সংশ্লেষ। এর অন্য কারণও রয়েছে। সুধীন দত্ত যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞান-মনস্ক। প্রমাণ ছাড়া অন্তঃসারশূন্য বিষয়ের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। বস্তুসত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপে কবিতা সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কেবল ভাবের জগতে বিচরণ করে, যুক্তিহীন স্বপ্নচারিতায় প্রতিভার অপচয় সময়ের অপব্যবহারে ছিলেন অনীহ। যা কিছু দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাকেই কবিতায় রূপান্তর করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়-আশয় হয়ে উঠেছে খুব তুচ্ছ বিষয়ও, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গির আভিজাত্যে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি। 'উটপাখি', 'কুক্কুট' নিয়ে কবিতা লিখেছেন তেমনি লিখেছেন দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র, অধ্যাত্ম-সংকট নিয়েও। কিন্তু এসব কবিতাকে কোনোভাবেই বিষয়ের অনুগত করে তোলেননি। তাঁর কবিতা যেমন দর্শনে আক্রান্ত নয়, তেমনি ধর্মীয় বাণী প্রচারের অনুষঙ্গও নয়। বরং কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতায় নিখিল নাস্তির সন্ধানও পেয়েছেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত__ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শব্দের অনুষঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জড়বাদী দুটি জিনিস তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একটি হচ্ছে তিনি যে নাস্তিক একথা বারবার বলতে চান। এই বলাটা তো কবিতা হয় না। কিন্তু এই বলাটাকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন কবিতায়। ''হয়তো ইশ্বর নেই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ''___বলে তিনি একটা পরিতোষ লাভের চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি সত্যিই অনাথ কি না এগুলো নিয়ে দার্শনিকরা চিন্তাভাবনা করুন, কিন্তু কবি এগুলো নিয়ে কথা বলবেন__ এটা ভাবতে আমাদের অসুবিধা লাগে এবং এটা একটা বক্তব্য মাত্র। এ বক্তব্যের নানা রকম প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি কবিতায়।' সুধীন্দ্রনাথের ঈশচিন্তা___ নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান অস্বস্তি বোধ করেছেন। কারণ সুধীন দত্ত যেমন নিখিল নাস্তির জয়গান গেয়েছেন, তেমনি সৈয়দ আলী আহসান আস্তিক্যকে করেছেন শিরোধার্য। ফলে বিশ্বাসের দিক থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর ছিলেন বলেই সুধীনদত্তের দার্শনিক অভিজ্ঞা সৈয়দ আলী আহসান নির্মোহ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে অনীহ ছিলেন। সুধীনদত্তের শিল্প -বা কাব্য সিদ্ধি নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান নিঃসংশয়; কিন্তু আদর্শিক বৈপরীত্যের কারণে তাঁর প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হতে পারেননি। একই রকম অপ্রসন্ন ছিলেন দীপ্তি ত্রিপাঠীও। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাঁর কাব্য কোনো আশ্বাসের আশ্রয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় না। সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমনকী আধুনিক কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয় কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা নৈরাশ্যভারাতুর নয়নে অবলোকন করছেন।' আধুনিক যুগে মানুষের প্রতি মানুষ প্রশ্নহীন আস্থা স্থাপন করতে পারে না বিচিত্র কারণে। জীবন-যাপনে যেখানে অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ বিগ্রহে যেখানে মুহূর্তে লাখ -

লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, সামান্য কারণে যেখানে মানুষ খুন হয়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের নাগরিকদের পেছনে গুপ্তচর লেলিয়ে দিয়ে রাখে, আণবিক বোমার আঘাতে এক-একটি ভূ-খ- মুহূর্তে ধধুলিস্যাৎ হয়ে যায়, যেখানে ঐশীশক্তির কোনো নিদর্শন দেখা যায় না, সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞান-মনস্ক কবি সংশয়ী হবেন; এটাই স্বাভাবিক। সুধীন দত্ত এই স্বভাবের জাতক। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের 'মৈমন্তী' কবিতায় লিখেছেন, 'বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়'। এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হতাশা আর ভালোবাসার জন্য কাকুতি এবং সবশেষে না-পাওয়া বেদনা। তাঁর মনে হয়েছে, চরাচরে চিরায়ত বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, নেই কোনো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোনো শক্তিও। ফলে তিনি আর 'শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে' সময় ব্যয় করবেন না। এই উপলব্ধি নিছক ধর্মবিদ্বেষ বা আস্থাহীনতা থেকে উদ্ভূত নয়, নয় নাস্তিক্যের চেতনা থেকেও। তাহলে অন্যত্র (চপলা কবিতায়) উচ্চারণ করতেন না, 'জনমে জনমে, মরণে মরণে, / মনে হয় যেন তোমারে চিনি।' নিখিল নাস্তিক বহুজনম বা পুনজন্ম বিশ্বাস করবেন কোন ভিতের ওপর নির্ভর করে?

সমাজ-জীবনে সত্য-মিথ্যার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু এই সত্য-মিথ্যা আপেক্ষিক, না শাশ্বত? যদি যুক্তিবোধ এবং বাস্তবতার নিরিখে সত্য-মিথ্যা নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে সত্য এবং মিথ্যা দুটি আপেক্ষিক পদ মাত্র; দুটিই সাপেক্ষ পদ। একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। মানবজীবনে এ ধরনের তর্কের সামাজিক কি আর্থিক, কোনো মূল্য নেই। কিন্তু শিল্পের প্রশ্নে__ বিশেষত কবিতায় সত্য-মিথ্যার সম্পস্পর্ক সুনিবিড়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সত্য পরিবর্তনশীল ক্রমবির্ধমান ও সমাজাশ্রয়ী।' অর্থাৎ সত্যের কোনো চিরন্তন রূপ নেই। কবিতায় এ সত্য বা বাস্তবতার প্রসঙ্গ আরও সূসুক্ষ্মভাবে এসেছে। বাস্তবতা হলো একটি বস্তুকে মানুষস কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে? মানুষের উপলব্ধি এবং বোধের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি বস্তুর গুণাগুণ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও। কবিতা মানুষের উপলব্ধিজাত বিষয়গুলোর একটি। তাই কবিতার সত্য এবং বস্তুসত্য কোনোকালেই এক ছিল না, এখনো নয়।

সময়, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের ধরন সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ। জীবন ও সংসার সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি স্পষ্ট, কিন্তু ওই অভিজ্ঞান প্রকাশে সংশয়ী। ফলে তাঁর চেতনার উপরিতল সম্পর্কে 'নাস্তিপ্রবণ' বলে শনাক্ত করা হয়। মহাশূন্যের দিকে তাকালে তাঁর মনে হয় 'নির্বাক নীল, নির্মম মহাকাশ'। কল্পনাপ্রবণ কবির কাছে নীল যেখানে রোম্যান্টিকতার প্রতীক, বুদ্ধিবাদী কবির কাছে সেখানে কেবল নির্মম। অথচ 'নাম' কবিতায় শুরুতে তাঁকে অস্থির ও অধীর মনে হয়। কাঙ্ক্ষিক্ষতকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য কালক্ষেপণ করার ৈ ধর্য নেই তাঁর। কাঙ্ক্ষিক্ষতের অভাবে 'অসহ্য অধুনা' এবং 'ভবিষ্যৎত বন্ধ অন্ধকার', ফলে তার 'কাম্য শুধু স্থবির মরণ'। চাওয়ার সঙ্গে সব সময় পাওয়ার সমন্বয় ঘটে না। হয়তো তাই, এই অস্থিরতা। হয়তো এ কারণেই এই উচ্চারণÑ'বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত / ক্ষণিক পুষ্পের লোভে।' কিন্তু এ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির নিকট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

উটপাখী

অধ্যাত্মসংকট বাঙালির মৌলসংকট। এ সংকট বাঙালির উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ইচ্ছা করলেই যুক্তিবোধ, গবেষণা এবং বিজ্ঞান দিয়ে এ সংকট থেকে তার উত্তরণের সম্ভাবনা নেই। অন্তত যত দিন, বাঙালিজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কার্যকারণ জলবায়ু পরিবর্তনও আবহাওয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্কের ফল বলে স্বীকৃত না হয়, তত দিন তার মনে হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ মানবজাতির পাপাচারের ফল__ শাস্তি। এ কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গ নয়, জাগতিক স্বার্থশ্লিষ্ট বিষয়েও প্রাসঙ্গিক। এ সম্পর্কে 'উটপাখি' উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রথম চার পঙিক্ত স্মরণ করা যাক__

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরু ভূমি;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।

শূন্য মরুর বুকে হতাশাগ্রস্ত জীবন স্বাভাবিক। সেখানে যেকোনো ধরনের আহ্বান তৃষ্ণার্তের জন্য মহার্ঘ্যতুল্য। কিন্তু যখন একজন তৃষ্ণার্ত আশ্রয়-ভালোবাসার আহ্বানও নীরবে উপেক্ষা করে তখন আহ্বানকারীরও আÍমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তখন তারও মনে হতে পারে 'ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে'। যে উটপাখিকে কবির মনে হয়, মরুদ্বীপের সমস্ত খবর জানা প্রাণী, তাকেই আবার স্মরণ করিয়ে দেন কবি__ 'তুমি তো কখনও বিপদপ্রাজ্ঞ নও'। অর্থাৎ মানুষ বা প্রাণীÑ সবাই অতীতের ঘটনা পর্যালোচনা করে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ সম্পর্কও আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু অতীত-বর্তমানের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চিত বার্তা কেউ দিতে পারে না; কেবল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। ফলে অতীতের সাক্ষী হয়েও কেউ কখনো সর্বজ্ঞ হতে পারে না। সঙ্গত কারণে চরাচরের নানা সম্পর্কের ধরন ও বিভেদের দায় একা কারও নয়।

আমরা জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার;

অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি করে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি।

জাতির উদ্ধারকারী হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে শেষের চার পঙক্তি অনন্যসাধারণ। আর 'অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে' একই সঙ্গে প্রশ্নশীল উপলব্ধি ও প্রবচন। পুরো কবিতায় পরার্থপরতাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। উটপাখি একটি প্রতীক মাত্র, আড়ালে সমাজ ও রাজনৈতিক বিমুখ, উদাসীন মানুষের প্রমূর্তি। তাই সতর্ক উচ্চারণ__'ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে'।

মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্য নিয়ম তৈরি করে; নিজেই সে নিয়ম লঙ্ঘংঘন করে অন্যতর প্রয়োজনে। অন্যে যখন নিয়ম লঙ্ঘন করে তখন তার জন্য শাস্তি কামনা করে, কিন্তু নিজের নিয়ম লঙ্ঘনকে দেয় বৈধতা। মানবচরিত্রের এই এক ভয়াবহ দ্বৈরথ। দ্বিমুখী স্বভাব তার। অন্যকে শাস্তি দিতে সে কুণ্ঠাহীন, নিজের দোষের ক্ষেত্রে তৈরি করে অন্য বিধি। যে কাজ অন্যের বেলা গর্হিত বলে প্রচার করে, সে কাজ নিজের জন্য করে তোলে গর্বের। অন্তত এমনটাই প্রচার করে সে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এ বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।"

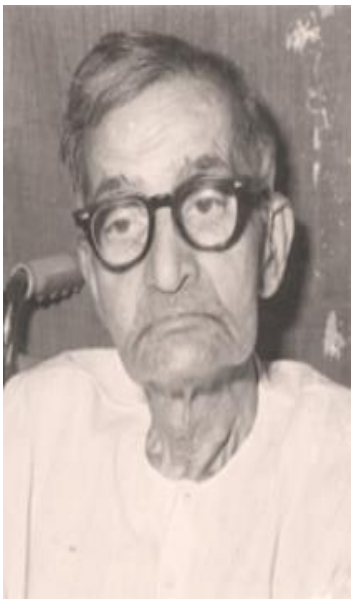

খ. সংগতি

অমিয় চক্রবর্তী(জন্ম: এপ্রিল ১০, ১৯০১ - মৃত্যু: জুন ১২, ১৯৮৬)

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙ্গা দরজাটা।
মেলাবেন।

পাগল দাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকাশে আগুনে তৃষ্ণার মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,-
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল-
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।

জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ-
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ্ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
-মেলাবেন।

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুরো বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু - লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায় -
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন তিনি, মেলাবেন।

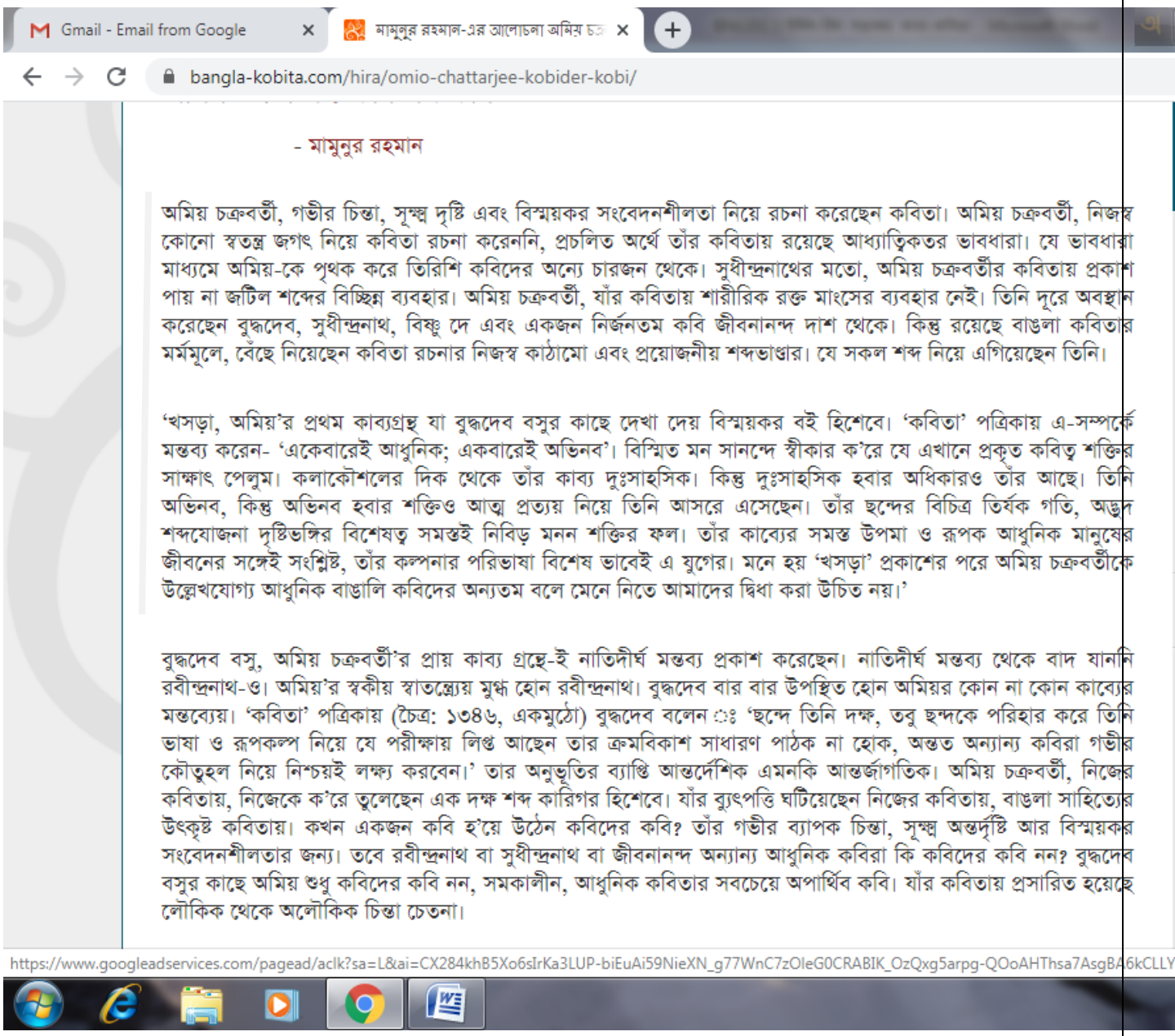
Gmail - Email from Google
মামুনুর রহমান-এর আলোচনা অমিয় চ
bangla-kobita.com/hira/omio-chattarjee-kobider-kobi/
- মামুনুর রহমান
অমিয় চক্রবর্তী, গভীর চিন্তা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিস্ময়কর সংবেদনশীলতা নিয়ে রচনা করেছেন কবিতা। অমিয় চক্রবর্তী, নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র জগৎ নিয়ে কবিতা রচনা করেননি, প্রচলিত অর্থে তাঁর কবিতায় রয়েছে আধ্যাত্মিকতর ভাবধারা। যে ভাবধারা মাধ্যমে অমিয়-কে পৃথক করে তিরিশি কবিদের অন্যে চারজন থেকে। সুধীন্দ্রনাথের মতো, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রকাশ পায় না জটিল শব্দের বিচ্ছিন্ন ব্যবহার। অমিয় চক্রবর্তী, যাঁর কবিতায় শারীরিক রক্ত মাংসের ব্যবহার নেই। তিনি দূরে অবস্থান করেছেন বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং একজন নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশ থেকে। কিন্তু রয়েছে বাঙলা কবিতার মর্মমূলে, বেঁছে নিয়েছেন কবিতা রচনার নিজস্ব কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় শব্দভাণ্ডার। যে সকল শব্দ নিয়ে এগিয়েছেন তিনি।
'খসড়া, অমিয়'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ যা বুদ্ধদেব বসুর কাছে দেখা দেয় বিস্ময়কর বই হিশেবে। 'কবিতা' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেন- 'একেবারেই আধুনিক; একবারেই অভিনব'। বিস্মিত মন সানন্দে স্বীকার ক'রে যে এখানে প্রকৃত কবিত্ব শক্তির সাক্ষাৎ পেলুম। কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর কাব্য দুঃসাহসিক। কিন্তু দুঃসাহসিক হবার অধিকারও তাঁর আছে। তিনি অভিনব, কিন্তু অভিনব হবার শক্তিও আত্ম প্রত্যয় নিয়ে তিনি আসরে এসেছেন। তাঁর ছন্দের বিচিত্র তির্যক গতি, অদ্ভুদ শব্দযোজনা দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব সমস্তই নিবিড় মনন শক্তির ফল। তাঁর কাব্যের সমস্ত উপমা ও রূপক আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তাঁর কল্পনার পরিভাষা বিশেষ ভাবেই এ যুগের। মনে হয় 'খসড়া' প্রকাশের পরে অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অন্যতম বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়।'
বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী'র প্রায় কাব্য গ্রন্থে-ই নাতিদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। নাতিদীর্ঘ মন্তব্য থেকে বাদ যাননি রবীন্দ্রনাথ-ও। অমিয়'র স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হোন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব বার বার উপস্থিত হোন অমিয়র কোন না কোন কাব্যের মন্তব্যেয়। 'কবিতা' পত্রিকায় (চৈত্র: ১৩৪৬, একমুঠো) বুদ্ধদেব বলেন ঃ 'ছন্দে তিনি দক্ষ, তবু ছন্দকে পরিহার করে তিনি ভাষা ও রূপকল্প নিয়ে যে পরীক্ষায় লিপ্ত আছেন তার ক্রমবিকাশ সাধারণ পাঠক না হোক, অন্তত অন্যান্য কবিরা গভীর কৌতুহল নিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন।' তার অনুভূতির ব্যাপ্তি আন্তর্দেশিক এমনকি আন্তর্জাগতিক। অমিয় চক্রবর্তী, নিজের কবিতায়, নিজেকে ক'রে তুলেছেন এক দক্ষ শব্দ কারিগর হিশেবে। যাঁর ব্যুৎপত্তি ঘটিয়েছেন নিজের কবিতায়, বাঙলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কবিতায়। কখন একজন কবি হ'য়ে উঠেন কবিদের কবি? তাঁর গভীর ব্যাপক চিন্তা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আর বিস্ময়কর সংবেদনশীলতার জন্য। তবে রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ অন্যান্য আধুনিক কবিরা কি কবিদের কবি নন? বুদ্ধদেব বসুর কাছে অমিয় শুধু কবিদের কবি নন, সমকালীন, আধুনিক কবিতার সবচেয়ে অপার্থিব কবি। যাঁর কবিতায় প্রসারিত হয়েছে লৌকিক থেকে অলৌকিক চিন্তা চেতনা।
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CX284khB5Xo6sIrKa3LUP-biEuAi59NieXN_g77WnC7zOleG0CRABIK_OzQxg5arpg-QOoAHThsa7AsgBA6kCLLY

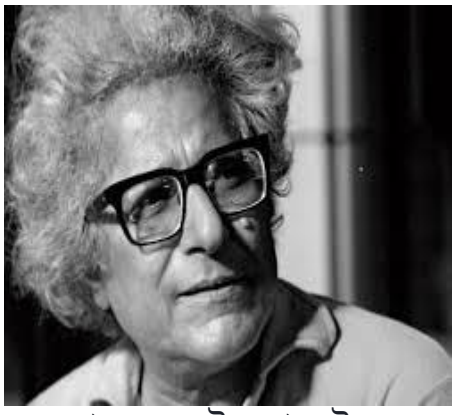

গ. ফুল ফুটুক না ফুটুক

-- সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১২ ফ্রেবুয়ারি ১৯১৯ ৮ জুলাই ২০০৩

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত
শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে -
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে -
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।
গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা

কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
- তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল -
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !
তারপর দাড়ম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখন ও হাসছে।

আলোচনা সংক্ষেপ

কবি সুভাষঃ টুকরো ১: যে কবি তাঁর কাব্য-ভূমিকার মাধ্যমে বাংলা কবিতার এক নতুন ভূমি তৈরি করেছেন, সেই ভূমির ঔজ্জ্বল্যে বাংলা কবিতা পেয়েছে–ভিন্নমাত্রা। সেই ভিন্নমাত্রায় স্বাদ নিতে পাঠক হয়ে তাঁর কবিতা গ্রহণ করি, তাঁর কবিতার কাছে যাই। সেই কবি হলেন–কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দর্শনায় কবি জন্মগ্রহণ করেন, শৈশব কাটে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায়, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় থিতু হন, মৃত্যু হলো অবশেষে সেখানেই–কলকাতায়, ৮ জুলাই ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী এ অন্যান্য লেখা নিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ৭০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও লেখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিভিন্ন সংগঠন, পত্রিকা সম্পাদনাসহ নানা রকম কাজেও তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে নানামুখী সংবেদনশীল ভূমিকায়ও তৎপর ছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বরে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক'-এর ইস্তেহার প্রকাশিত হয়, এরই সূত্র ধরে ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর গোড়াপত্তন হয়। এর ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মানস-চেতনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৩৬ সালের ২৫ জুন কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও জড়িত ছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯১৬-১৯৮৪), প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪)। এই উদ্যোগের সঙ্গে আরও যুক্ত ছিলেন–হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সায়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সমর সেন প্রমুখ। আমরা লক্ষ্য করি যে, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সৃজনশীল সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনার প্রকাশ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। পরিচয় (১৯৩১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশ হলে–তা মার্কসবাদী চেতনা ধারণের অন্যতম বাহন হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই অবিভক্ত বাংলায় ২৮টি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠন গড়ে উঠলে–সমাজে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রভাববলয় বিস্তৃত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা জীবনবাদী প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষ ঘটাতে থাকেন। অন্যদিকে অবিভক্ত ভারতবর্ষ তখন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন দ্বারা শৃঙ্খলিত ও পরাধীন। এমন সময়কালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা কবিতার ধারাবাহিক অবস্থানে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে; শুধু সাম্যবাদী চেতনাগত দিক থেকে নয়, কবিতায় প্রকরণগত নিরীক্ষা ও শিল্পসৌকর্যের বৈশিষ্ট্যের কারণেও। উল্লেখ্য, বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা শুধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রথম উচ্চকিত হয়নি। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়ও তা প্রবলভাবে উচ্চকিত। জীবনানন্দ দাশও এ ধারায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কবির কবিতায়ও সাম্যবাদী চেতনার উজ্জ্বলতা আমরা লক্ষ্য করি। পরবর্তীকালে সাম্যবাদী চেতনার অভিজ্ঞান বহুভাবেই কবিতায় ও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে

টুকরো-২ : পদাতিক, চিরকুট ও অগ্নিকোণের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থে ভিন্নমাত্রায় বাঁকবদলের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা এই গ্রন্থের কবিতাগুলো শহর-গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের গভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় উন্মুখ হয়। এই সময়কালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংসার জীবনে প্রবেশ করেন, অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বিভিন্নমুখী পরিবর্তন ঘটে, বিশ্বে বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাত নতুন তাৎপর্যে উপস্থিত হয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন ও বিভক্ত হয়, কমিউনিস্ট পার্টির রণরীতি বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে পড়ে। এমন পরিস্থিতি নিয়ে কবির মানস-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতেই পারে। কবির দায়িত্ব শুধু কবিতা লেখা নয়, যুগের সত্যকে আবিষ্কার করা, সেইসাথে সেই সত্যকে কবিতার প্রাণময়তা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। এই দিক থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবিরা–তো অগ্রগামী। 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় সেই বহুল পরিচিত পংক্তি আমরা পাই– 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।'

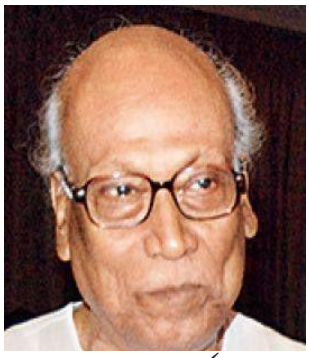

বাবরের প্রার্থনা

শ ঙ্খ ঘো ষ

****

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূণ্য হাত -
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়।
চোখের সমুখে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা।

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূণ্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজানুতে
কোনই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি

পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

সাধারণ আলোচনা

আধুনিক বাংলা কবিতার এক শক্তিমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবি শঙ্খ ঘোষ। এক সংবেদনশীল, অনুভূতি-পরায়ন মন নিয়ে একজন চিত্রকর যেমন রং ও রেখার স্পর্শে জীবন্ত করে তোলেন মনের গোপন রহস্য, তেমনি তিনি সমসাময়িক মানুষের জীবন ও তার বহুমুখী বৈচিত্র, তার সুখ-দুঃখ-আনন্দকে স্পর্শ করেছেন তাঁর কবিতায়। সময়ের যন্ত্রণা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত হাহাকার ব্যক্তি মানুষকে যে ক্রমশ অসহায় নিরালম্ব এক শূণ্যতায় নিক্ষেপ করছে- একথা তিনি যেমন তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি পাশাপাশি তিমির হননের গান গেয়েছেন। অন্ধকারের অবসানে জ্বালাতে চেয়েছেন প্রাণের উজ্জ্বল আলো। তাই শঙ্খ ঘোষ সমসাময়িক বাংলা কবিতার জগতে এক ব্যতিক্রমী কবি।

‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতাটি রচনাকাল ১৯৭৪ সাল। কবিতাটি ৬টি স্তবকে, ২৪ টি পংক্তিতে, এক বিবেকী সংবেদনশীল কবির অনুভূতিশীল মনের ছোঁয়ায় আমাদের মুগ্ধ করে। ১৯৭৪ সাল বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক নীরেট দুঃস্বপ্নের কাল। সারাদেশ জরুরি অবস্থা, চারিদিকে দম বন্ধ করা এক কালো ছায়া। তরুণ যুব সমাজ অতি ভয়ঙ্কর রক্তস্নাত রাত্রির বিভীষিকায় দিশাহারা। দেশের রাজনীতি তার করাল থাবা মেরে গ্রাস করেছে মানুষের স্বাভাবিক দিনগুলিকে। যেখানে-সেখানে গুপ্তহত্যা, হিংসা, গুপ্তঘাতকের ছুরি ঝলসে উঠেছিল। গোটা সমাজটাই দিশাহারা, যেন অসুস্থ রোগের প্রকোপে শুয়ে আছে মৃত্যুশয্যায়। এরূপ এক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে কবির ব্যক্তি-জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৪ সালের হেমন্তের সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবেই জন্ম হয়েছে এই অসাধারণ কবিতাটির।

‘কবিতার প্রাক-মুহূর্ত’ নামক গ্রন্থে আমরা জেনেছি যে কবির কন্যা কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসা-বিভ্রাটে দিনে-দিনে তার রোগ আরও বেড়ে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে তার লাবণ্য; অথচ এই কিশোরী মেয়েটির তখন ফুলের মতো ফুটে ওঠার বয়স। তাই কবির মন খুবই বিষন্ন, কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। সেরকম এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্জন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পদচারণা করতে করতে কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। মুঘল সম্রাট বাবর-এর পুত্র হুমায়ুন যখন কিছুতেই সুস্থ হচ্ছেন না, তখন বাবর একদিন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছে, পুত্র হুমায়ূনের আরোগ্য কামনা করে। তারপর ধীরে ধীরে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সম্রাট বেশিদিন বাঁচেন নি। এই ছোট্ট ঐতিহাসিক তথ্যটির এক নব-তাৎপর্য দান করলেন আলোচ্য কবিতাটিতে।

পিতার প্রার্থনা, গুরুজনদের আশীর্বাদ ও মঙ্গলকামনায় কোন পুত্র বা পুত্রসম স্নেহজনদের আরোগ্যলাভ ঘটে কিনা, তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাপেক্ষ হলেও, মানুষের সত্য-কামনায়, সত্যনিষ্ঠায় ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় যে মনের জোর সৃষ্টি হয়, তারই বরে মানুষ কখনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থগুলিতে এরূপ অনেক ঘটনার কথা আছে যেগুলিকে অলৌকিক বলে উড়িয়ে না দিয়ে যদি এইভাবে ভাবতে পারি যে, শুধু বিশ্বাসের দ্বারা অসাধ্যকে সাধন করেছেন। এই যুগে এই সেদিন মাদার টেরেসার অলৌকিক শক্তির কথা খ্রিস্টান সমাজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের সামনে স্বীকার করেছেন। হয়তো কিছুটা ঘটনা, কিছুটা বিশ্বাস মিলিয়ে তৈরি হয় মিথগুলি। হুমায়ূনের জন্য বাবরের ঐকান্তিক প্রার্থনার সত্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ প্রার্থনা জানিয়েছেন পরম শক্তিমানের কাছে কন্যার রোগমুক্তির।

কবিতাটির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে ব্যক্তি মানুষের প্রার্থনা সারা পৃথিবীর অসুস্থ মানুষের রোগ মুক্তির প্রার্থনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অশান্ত, অচরিতার্থ প্রাণ। প্রায় নিঃশেষিত ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত বিনা অপরাধে প্রাণ দিচ্ছে শত শত তরুণ যুবক তাদের বিশ্বাস কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। প্রতিদিন পুলিশের গুলিতে বা ঘাতকের ছুরিতে রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেশ। দেশের যুব সমাজ আজ অসুস্থ বাবরের পুত্রের মতো, মৃত্যুর প্রহর গুনে চলেছে। শুধু কবির নয়, যেকোন পিতার যে কোন পুত্র আজ রোগশয্যায়। কবি একজন স্নেহময় পিতারূপে তাদের সকলের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়ে সেই তরুণ-যুবকদের জীবন লাভ ঘটুক।

“এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।”

শত-সহস্র তরুণ-তরুনীর জন্য কবি কাতর। শত-শত শুষ্ক মুখের ঘুরে বেড়ানো ছাত্রদের জন্য উদ্বিগ্ন কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর অনুভূতিশীল মনে তাদের কষ্টকে ভুলতে পারেননি বলেই নিজের কন্যার কথা ভাবতে ভাবতে তার চিন্তার সরণিতে এসে পৌঁছেছে সম্রাট বাবরের কথা, আরও বৃহত্তর ভাবে সমগ্র দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা। যেমন সন্ত্রাসবাদের যুগে মানসিক যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

"আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।"

সেই যন্ত্রণা, সেই আবেগ, কবি শঙ্খ ঘোষকেও স্পর্শ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে এই সরলমতি যুবসমাজ আজ যে দিশাহারা, মৃত্যুর মুখোমুখি, অসুস্থ, তার জন্য তাদের কোন দায় নেই। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। সভ্যতা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ নারকীয় গতিতে ধ্বংস করতে আসছে মানুষের জীবনকে। দুর্নীতি, পাপ, অন্যায়, শঠতায় ছেয়ে গেছে দেশ। সকলের শুদ্ধচৈতন্যের জাগরন না ঘটলে এই যুব সমাজ কি করে মুক্তি পাবে!

"নাকি এ শরীরে পাপের বীজাণুতে
কোন প্রাণ নেই ভবিষ্যতের
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যুকে ডেকে আনি নিজের ঘরে।"

যদি মানুষ নতজানু হয়ে প্রার্থনায় না বসে, যদি পাপ হিংসা লোভ কে জয় করে শুদ্ধ চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে না পারে, তবে একদিন এই বর্বর আগুনের ঝলসানিতে সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ কোন পিতা, কোন বিবেকবান মানুষ তা চান না। তাই কবিতাটির শেষ স্তবকে এসে তিনি নিজেকে নিঃশেষ করতে চান, নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে আত্মজকে রক্ষা করতে চান।

"ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

সমাজ-সচেতন মানবতাবোধের দলিল হিসাবে কবিতাটি সার্থক হয়েছে।

চ. যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়---আমি চলে যেতে পারি

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-'৯৫)

১৯৮৩ সালে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।[৩][৪] ১৯৯৪ সালে *আই ক্যান, বাট হোয়াই শুড আই গো* শিরোনামে জয়ন্ত মহাপাত্র কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৫] ১৯৯৯ সালে *যা সাকি ছি কিক্ত কিয়ে যাও* শিরোনামে রাম চরণ ঠাকুর কর্তৃক মৈথিলী ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৩]

যেতে পারি কিক্ত কেন যাবো

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এতো কালো মেখেছি দু হাতে

এতোকাল ধরে!

কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে

চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়

এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে

চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি

যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি

কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো

কিন্তু, এখনি যাবো না

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো

একাকী যাবো না, অসময়ে।।

প্রবন্ধ : ৪। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-চেতনা : 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'

০৮ ই জানুয়ারি, ২০১০ রাত ১:১১

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-'৯৫) ইহলোকে আমাদের মাঝে আজ আর নেই একথা নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন? একথা আমরা কেউ জানি না। শক্তির মতো অন্য যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের ঠিকানাও আমরা জানি না। অতএব একইভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানাও আমরা জানি না। হয়তো মৃত মানুষের ঠিকানা জানা যায় না। তবে একথাও সত্য যে শক্তির মতো অনেকেই দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করেও আমাদের আত্মার খুব কাছাকাছি বসবাস করেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে প্রাণের ক্ষয় অনিবার্য হলেও প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা-বিচ্ছুতির আলোকরশ্মির কোনো ক্ষয় নেই। শক্তি ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়া আগেই স্বীয় সৃজন-প্রতিভার যে আলো ছড়িয়েছেন তা কোনো দিনি ম্লান

হবে না। প্রতিভার এই আলো আমাদের ছেড়ে চলেও যাবে না কোনো দিন। যেমন যায় নি-- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ; তেমনি শক্তিও থেকে যাবে স্বীয় রচনার বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিতে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকে কাব্যযাত্রা শুরু করলেও প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিলেন ষাটের ধমকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬২) প্রকাশের মধ্য দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক রহস্যময়তার অবভাস সৃষ্টি করলেন তিরিশের কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো। তবে তিনি তিরিশের সম্প্রসারিত মানসিকতার পরিবর্তে নিজস্বতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ধীরে ধীরে। এক সময় এসে দেখা গেল তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব এক কাব্যভাষা নির্মাণ করলেন, যা আপাত-অর্থে সহজ-সরল কিন্তু সেই সারল্যের মোড়কে তিনি চিন্তাসূত্রের রহস্য লুকিয়ে ফেললেন। ভাববাদ প্রভাবিত দার্শনিক চেতনা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সেই ভাববাদকে তিনি আনবিক যুগের বস্তুবাদের সংমিশ্রণে প্রকাশ করেছেন কবিতায়। ফলে তাঁর কাব্যভাষা সহজ-সরল, কিন্তু অর্থ বা কাব্যচেতনা ভাবের অপার রহস্যময়তায় আবৃত। একথা ঠিক প্রথম গ্রন্থের কবি শক্তি ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন আশির দশকে। আশির দশকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কাব্য 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' (১৯৮২) প্রকাশিত হয়; তিনি এই কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও লাভ করেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা কবিতাঙ্গনে রবীন্দ্র-জীবনানন্দ উত্তরকালে সত্যিকার অর্থে শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতার বিষয়-বিন্যাস, প্রকরণ বৈচিত্র্য এবং কাব্য-বুননে দক্ষতা অসাধারণ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৮২ সালে রচনা করলেন 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'; এ কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ এখানে বিশেষ তাৎপর্য ও দ্যোতনাবাহী। তিনি ঐ সময় খুব বেশি এলিয়েনেটেড হয়ে পড়েছিলেন যে কারেণে হয়তো আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এই প্রকল্পটি যদি সত্যি হয় সেক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তা হচ্ছে-- তিনি যদি আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও থাকেন, সেই এলিয়েনেশনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছিলেন-- ‘কিন্তু কেন যাব’। আমাদে কল্পিত ধারণার অনেক কারণ তাঁর 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা সম্ভব। যেমন তিনি ‘এখন আমার কোনো অভিমান নেই’ কবিতায় অক্ষরবৃত্তের অসাধারণ গাঁথুনিতে তুলে ধরেছেন সেই অভিমানহীনতার কথা :

মাটির কলস কেন অভিমান করে?
গা-ভরা জলের ফোঁটা নামে এঁকেবেঁকে--
নীচে যেন নদী পাবে, প্রিয় মুখ পাবে,
বুকের দীঘিটি নোনা জলেই ভাসাবে
আজ। কেন? সুযোগ মিলেছে? (এখন আমার কোনো অভিমান নেই, পৃ.২৮)

এখানে ‘মাটির কলস’-তো প্রকান্তরে মাটির তৈরি মানব শরীরকেই বুঝিয়েছেন কবি। যে দেহ থেকে নানা

কারণে অশ্রুবিন্দু ঝরে, যন্ত্রণায় কাতর হয় এবং সর্বোপরি অভিমান তাকে পেয়ে বসে চরম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; মানব মননের এই অভিমানাহত বৃত্তায়িত খাঁচা থেকে বেরুতে না পারলে, তখন সেই বন্দী মানুষের পক্ষে আত্মঘাতী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কবির অভিমান সংসারের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাঁদের থাকে এক নিজস্ব ভুবন; যে ভুবনের অধিশ্বর তিনি নিজেই। কবির নির্মিত সেই কাব্য-ভুবনে মাত্র দশ বছরে কতটা বদল ঘটেছে তা কবি বর্ণনা করে লিখেছেন : 'মানুষের মুখচোখ মাত্র দশবছরে বদলে গেছে।' (দশবছর আগে-পরে, পৃ. ৫৮) কিন্তু এ পরিবর্তন? এই রূপান্তর কিংবা পরিবর্তন কী কবি শক্তির কাম্য ছিল না? তাই তিনি যন্ত্রণাবিদ্ধ হন; কিন্তু নিজেকে তাৎক্ষণিক সামলে নিতেও পারেন। যেমন :

তবে হবে পরে হবে, সবকিছুর যখন ছাড়ের
আওতায় এসেছে, একে সবিশেষ ছাড় দিতে হবে।
(সবিশেষ ছাড়, পৃ. ৫৯)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় উত্তর আধুনিক সাহিত্য-তত্ত্বের বিতর্কে বসে কবিতা লিখেছেন। সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে যখন তর্ক-বিতর্ক ওরিয়ান্টালিজম, পোস্ট-কলোনিয়াল বিষযক তত্ত্ব নিয়ে তখন শক্তির কবিতায় ভারতীয় ভাববাদী দর্শন অবলীলায় জায়গা করে নিয়েছে। তিনি মৃত্যুচিন্তায় ডুবে যেতে যেতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে মৃত্যুর সামনে বাঁধ দেয়ার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে মৃত্যু অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী সত্য। মৃত্যুকে প্রতিরোধের কোন উপায় নেই। এরপর শক্তি চট্টোপাধ্যায় এতটা শক্তি (বল) কোথায় পান যে, তিনি যাবেন না বলে দৃপ্ত ঘোষণা করেন? কিন্তু যেতে তো হবেই। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন : 'যেতে নাহি দিব হায়!/ তবু যেতে দিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথও এক সময় দম্ভোক্তি করে লিখেছিলেন : 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' কিন্তু চরম ভাববাদী রবীন্দ্রনাথকেও মৃত্যুর হেমলক পান করতে হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই আপ্ত বাক্যে উর্ধ্বে নন; যখন তিনি রক্তেমাংসে গড়া একজন মানুষ। যতোই দম্ভ করুন শক্তি, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েই লিখেছেন 'এপিটাফ' শীর্ষক কবিতা। বলাবাহুল্য এই এপিটাফ আর কারো জন্য নয়, একান্তভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজের জন্যই রচনা করেছেন তিনি। আট পংক্তির 'এপিটাফ' কবিতায় তিনি নিজের যাপিত জীবনকথা লিখে রাখতে চেয়েছেন :

কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছির খুব।
মারা গেলে মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ,
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না।
(এপিটাফ, পৃ.৬৪)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো কাব্যগ্রন্থে মৃত্যুবোধ প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। মৃত্যু-ভাবনায় কবির অন্তর্জগত ভেঙে তছনছ হয়ে না গেলে তিনি কী বলতে পারতেন :

পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।

পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।

কারণ একটা সময় আসে, আসতে পারে
যখন আগুন অসহ্য হয় নদীর নদীর ধরে।
(মৃত্যু, পৃ.১২)

অথচ এ কাব্যগ্রন্থের নামকরণে কবি বড্ড অহংকার করেছিলেন তিনি যাবেন না। তিনি তো জানতেন রবীন্দ্রনাথের কথা-- 'তবু যেতে দিতে হয়।' অবশ্য 'বিড়াল' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর অহংকারের বেলুন ফুটো করে দিয়ে লিখেছেন : 'পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল/ খুব কাছে বসে আছে হিতব্রতী অসুস্থ বিড়াল/ কাছে বসে আছে কিছু পাবে বলে, অমরতা পাবে।' (বিড়াল, পৃ.১৪) জেনেও না জানা কিংবা দেখেও না দেখার ভাব করা অনেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব। শক্তি জানতেন : 'সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুখী বিড়াল।' (বিড়াল, পৃ.১৮) আসলে প্রাণপণে এই 'অসুস্থ' এবং 'অসুখী' বিড়ালটাকে তাড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কী বৃথা প্রয়াস! সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যখন নিজের কাছে নিকেকে উপস্থাপন করেছেন, তখন ঠিকই তাঁকে লিখতে হয়েছে 'এপিটাপ'-এর মতো কবিতা। কিন্তু শক্তি লড়াই করেছেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে। দু'হাতে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন মৃত্যু-ভয়কে। অর্থাৎ একটা জেদ ঠিকই ছিল শক্তির অন্তর্জগতে। তাই তো কবি লিখেছেন :

সমুদ্র জীবিত আছে, মৌনের উপরে আছে মেঘ,
মেঘের মতন এলোমেলো ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে,
আবার গুটিয়ে যায়, কেন্নোর মতন, ছোঁয়া লেগে।
ফুঁসে ফিরে আসে ফের, ঘা-খাওয়া জন্তুর মতো, তীরে।
(নিচ থেকে আমি ঐ রূপবান, পৃ. ১৭)

'সমুদ্র' প্রতীকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের লড়াই এবং অহংকার চিত্রিত করেছেন অনুরূপ চিত্রে। এখানে কবি সরাসরি নিজের কথা বলেছেন : '[...] পরিত্রাণ/ চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই/ শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের/ মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই।' (শুধু বাঁচতে চাই, পৃ.১৯) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এই যে এলোমেলো পংক্তি-- যার অর্থ খুঁজে খুঁজে হন্যে হয় পাঠক, তার পেছনে ক্রিয়াশীল কবির অন্তর্জগতের অপার রহস্যময়তা। পঞ্চাশের দশকে শক্তি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন বাংলা কবিতাঙ্গনে 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তারপর আর পিছে ফিরে তাকান নি তিনি। তিনি ক্রমাগত নিজেকে ভেঙে গড়ে বাংলা কবিতার চূড়াদেশে পৌঁছে গেলেন আশির দশকে। আর্চিবল্ড ম্যাকলিন-এর ভাষায় 'কবিতা শুধু হয়ে উঠতে থাকবে।' শক্তির কবিতাও এই সূত্রানুসারে হয়ে উঠেছে আর প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়েছে এক অপার রহস্যময়তার আড়ালে, অতল গহ্বরে। শক্তির কবিতার এই রহস্যময়তা এবং দৃশ্যমান অবচেতনার জগতে প্রবেশ করা সম্বন্ধে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

‘জীবনানন্দের কিছুকিছু কবিতা যেমন ‘ঘোড়া’ ‘বিড়াল’ ইত্যাদিতে যে-রহস্যময় অবচেতনার ইশারা স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল, শক্তি সেই রহস্যময়তাকেই ষাটের সময়পর্বে আবার গভীরভাবে ফিরিয়ে আনলেন কবিতায়।’ (মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশে ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, ১ম-প্র, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩; পৃ. ১৪৪)

কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবটুকু অর্থ উন্মোচন করেন দেন নি; টুকরো টুকরো অথবা বিচ্ছিন্নভাবে এক প্রতীকী প্রতিকল্প নির্মাণ করেন, যেখানে পাঠক কখনো কখনো রহস্যের অতল তলে ডুবে যায়। এ কাব্যগ্রন্থটিতেও ঠিক অনুরূপ অবভাস রয়েছে কবির মৃত্যু ভাবনা নিয়ে। একদিকে তিনি অহংকার করেন, অন্যদিকে তিনি ‘এপিটাফ’ রচনা করেন। জীবনানন্দীয় রহস্য তাঁর সহজ-সরল কাব্যভাষা আড়ালে গভীর অর্থের দ্যোতনাবাহী। যেতে পারি কিন্তু কেন যাব কাব্যগ্রন্থে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেই রহস্যের মায়াজাল। শক্তির সেই রহস্যের অতলে ডুব দিয়ে খুঁজে নিতে হয়-- তিনি কতটা মৃত্যু ভয়ে ভীত কিংবা মৃত্যু বিলাসী ছিলেন। এ গ্রন্থের কোন কোন কবিতায় মৃত্যু-বিলাস থাকলেও সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় কবির অন্তর জুড়ে ক্রিয়াশীল ছিল বিভীষিকাময় মৃত্যু-ভীতি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের নাম-শীর্ষক কবিতায়-ই মৃত্যুর কথা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে শানিত উচ্চারণ শোনা যায়। কবিকে মৃত্যু আহ্বান জানায় : ‘চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়/ কবিকে মৃত্যু তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে/ চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়।’ (যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?, পৃ.৯) মৃত্যু নামক অমোঘ নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করেন এক অবিশ্বাস্য আন্তর শক্তিতে : ‘যাবো/ কিন্তু এখনি যাবো না/ তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব/ একাকী যাবো না অসময়ে।’ (যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?, পৃ.৯)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা জুড়ে প্রেম-প্রকৃতির প্রতি অবিশ্বাস্য রকমের আকর্ষণ ও ভালোবাসা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েছেন, কিন্তু মনের ভেহরে তিনি আজো চির তরুন, চির সবুজ। তিনি এখনো চির কাঙাল ভালোবাসা আর প্রেমের : ‘কোলের কাঙাল আমি, পিপাসার্ত আমি,/ কেবলি চন্দন-চিতা আমন্ত্রণ করে :’ (তুমি একা থেকো, পৃ.১৮) মৃত্যুর এই আমন্ত্রণকে কবি সব-সময়ই উপেক্ষা করেন, মৃত্যুর পরোয়ানা উপেক্ষা করে কবি বলেন : ‘জল দাও শিকড়ে আমার/ জল দাও হৃদয় ভাসায়ে/ শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভাসাও/ আমার শিকড় দেহখানি।’ (ফিরে আসে, পৃ.২৪) অক্টোপাসের মতো মৃত্যু কবিকে টেনে ধরে, তারপর তিনি ‘শিকড়ে’ জল ঢালতে বলেন, শুধু বেঁচে থাকবেন বলে। কিন্তু কবি কী দেখেন নি-- মৃত্যুর অনিবার্য ও চিরন্তন সত্যতা? সম্ভবত এ কারণেই কবির মনে হয়েছে-- ‘জলে ভেজা, ভাঙা চোরা গুঁড়ো--/ জঙ্গলও কিছুটা উড়ো পুড়ো/ কী যেন কী হবে মনে হয়।’ (কী যেন কী হবে, পৃ.৩৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ‘মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান’। অথচ শেষ জীবনে তিনিই লিখলেন : ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।’ তারপরও পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়, অস্বীকার করা উপায় নেই মৃত্যু নামক

অনিবার্য সত্যকে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছিল না, তা নয়; ছিল। তিনিও জানতেন মৃত্যু অনিবার্য, অনস্বীকার্য সত্য। 'আগুন লেগেছে' কবির চারিধারে এবং 'লেগেছে অসহ্য টান বুকে ও পাথরে।/ পুড়েছে কমল, যার প্রান্ত নেই, শুধু ওড়ে ছাই ...।' (আগুন লেগেছে, পৃ.৩৯) এজন্যই সম্ভবত শক্তি চিন্তাভাবনা করে তাঁর মৃত্যুর আয়োজন করে লিখেছিলেন 'এপিটাফ'। আর প্রিয়-মানুষ এবং বিরহ-দুঃখে যে প্রিয়তমা তাঁকে বারবার ক্লান্ত করেছে, তার জন্য বিদায়ী প্রার্থনায় কবি লিখেছেন :

যা হয় তা হোক
কিন্তু, তুমি ভালো থেকো
তুমি ভালো থেকো।
(ভালো থেকো, পৃ. ৫৪)

সুতরাং এ কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাগুলোতে কবির মানস-প্রবণতা মৃত্যুকে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে শক্তি বা অহংকার দেখিয়ে বলেছিলেন : তিনি কেন যাবেন? সেই অহংকারের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে নীরবে কবি নিজের 'এপিটাফ' রচনা করেছেন। বিজ্ঞান-মনস্ক শক্তি জানেন কোন বস্তুই অবিনশ্বর নয়, তা একদিকে যেমন নশ্চর তেমনি পরিবর্তন ও রূপান্তরশীল। তাই শক্তির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'আগুনে পুড়ে গেল লোকটা-- কবি ও কাঙাল।' সুতরাং গ্রন্থের শেষ চরণে মৃত্যু ভয়ে ভীত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। তিনি মৃত্যুকে যেন আর ভয় পান না, তবে বস্তু জাগতিক নিয়মকে অস্বীকার করেন না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর এই ভয়কে জয় করতে পেরেছেন বলেই দৈহিকভাবে মৃত্যুর পরও যথার্থ মর্যাদায় পৃথিবীতে তাঁর পাঠকবৃন্দের হৃদয়ের পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং থাকবেন চিরকাল।

.....

দ্রষ্টব্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার উদ্ধৃতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থ থেকে।

.....

সূত্র : দৈনিক সংবাদ : ৫ মার্চ, ২০০৯

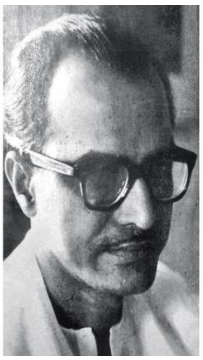

ছ. জননী যন্ত্রণাঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জননী যন্ত্রণা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় (১৭ জুন ১৯২০-২০ এপ্রিল ২০০৩)

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল কালি ঢালা কালনাগিনী দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে-যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয় |
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোন : ডাঙা |
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না,
রাতের জন্য ঘর যা পেলাম---পা তো টানে না
ছায়ার মত এক কোণে বউ, দুয়োরে তার ছা---
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না |
. এক যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে-ছেলে মা
. ঘর-যে তোমার ঘরে-ঘরে, জননী যন্ত্রণা ||

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল দু'কূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেইকে দিলাম হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি---কান্না আমার নয় |
কালি ঢালা নদী, বাঁকে ও-কার নৌকা, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা--- আমরা কে মন্দ কেউ ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ-বা কলে-কারখানায় |
একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলে হারালে--- ছেলে এলাম হাজারজনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে :
এক নামে যেই ডাকলে--- অনেক হলাম যে একজনা |
. ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা---
. জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা ||

কবি পরিচয় সংক্ষেপ ঃ 'ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—/ জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা'— একটা সময়ে পাঠকের মুখে মুখে ঘুরত 'জননী যন্ত্রণা' কবিতার এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়। স্রষ্টা কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৭ জুন ১৯২০-২০ এপ্রিল ২০০৩)-এর স্কুলজীবনে কবিতাচর্চায় হাতেখড়ি হলেও ১৯৪৪-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মেঘবৃষ্টিঝড়' কবিতাটি তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়। এ ছাড়াও লিখেছেন 'কবিতা', 'সীমান্ত', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন 'পরিচয়' পত্রিকা। প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের কাজে যুক্ত হয়ে সত্তর দশকে মস্কো প্রবাসী। স্নায়ু, মনপবন, কটি কবিতা ও একলব্য, বৈরী মন তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই। অনুবাদ করেছেন পাবলো নেরুদার কবিতা, রাশিয়ার গল্পসংগ্রহ, জীবনজয়ের পথে ইত্যাদি। গদ্যগ্রন্থের শিরোনাম কঠিন সবিতাব্রত। ডাক্তারি পড়ছিলেন, তিন বছরের মাথায় ছেড়ে দিলেন। অভিভাবকদের ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবেন, কিন্তু তিনি আঁকড়ে ধরলেন বামপন্থার স্বপ্নলালিত কবিতাময় নবজীবন। চল্লিশের দশকের এই কবির জন্মশতবর্ষের অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেল, তবু চোখে পড়ল না কোনও স্মরণ আয়োজন!

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী

দিনেশ দাস'এর কবিতা : সময়ের দলিল

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় [সংগৃহীত]

১৯২১এ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর কাজী নজরুল ইসলাম আপামর বাঙালির কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন 'বিদ্রোহী কবি' অভিধায়। নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এমন ব্যাপার ঘটেছে আর মাত্র একজনে ক্ষেত্রে – তিনি দিনেশ দাস। ১৯৩৮এ শারদসংখ্যা 'আনন্দ বাজার'এ 'কাস্তে' কবিতাটি প্রকাশের পর, তখন পঁচিশ বছরের নবীন কবি দিনেশ দাস রাতারাতি বাঙ্গালির কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন 'কাস্তে কবি' নামে। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে 'কাস্তে' কবিতার সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি 'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে' উদ্ধৃত করে দুটি কবিতা লিখলেন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' 'পত্রিকায় , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন ছোট গল্প। আমরা অতয়েব বুঝতে পারি বাংলা সাহিত্যের পাঠক জনমানসকে কি প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছিল একটি পাঁচ স্তবকে কুড়ি পংক্তির কবিতা। আজও – রচনার ছিয়াত্তর বছর পরেও 'কাস্তে' কবিতার কুড়িটি পংক্তি নতুনতর জীবনের বোধের আকাঙ্খায় থাকা মানুষের মনকে একই ভাবে আন্দোলিত করে। এখনও এই কবিতাটি নিয়ে গান করেন, দেওয়ালে পোষ্টার সাঁটেন পীড়িত মানুষের কোন সংগঠন, তাঁর কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করেন। কোন যাদুতে এমন সম্ভব ? অনেক পরে, জীবনের উপান্তে পৌঁছে কবি নিজেই শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন এই ভাবে –"আজ এই মহা দুর্যোগের দিনে এখনো আমি বিশ্বাস করি স্রষ্টা ও শিল্পীরাই এযুগের শেষ যাদুকর। 'কাস্তে' কবিতায় শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদটাকে তিনি শ্রমজীবী কৃষকের ফসল-কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন।

কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্য ও লাবণ্যের প্রতীক চাঁদকে তিনি খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুললেন। চাঁদের উপমায় আর এক চিরস্মরণীয় কাব্য পংক্তি সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'পূর্ণীমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' । ১৯৩৭এ দিনেশ দাস যখন 'কাস্তে' লিখলেন, সুকান্ত তখন ১১ বছরের বালক ।

দিনেশ দাস'এর আর একটি পংক্তি বোধ করি 'কাস্তে'র সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটির চেয়েও জনপ্রিয় – অনন্তকাল ধরে উচ্চারিত হবে ১৯৫১তে লেখা 'অহল্যা' কাব্যগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত 'প্রণমি' কবিতার শেষ স্তবকের চারটি পংক্তি "আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায় / ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম, / তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা /কোনখানে রাখবো প্রণাম" । সম্প্রতি কোন এক তরুণ আলোচকের কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করা মন্তব্য দেখেছিলাম যে 'পাঠককে শব্দের অর্থ আবিষ্কার করতে হবে , সহজ শব্দ খুঁজলে আর কবিতা পড়া কেন ? টিভি সিরিয়াল দেখো' । আমার বলতে ইচ্ছা করে - 'বাপু হে, আগে দু এক ছত্র দিনেশ দাস পড়ে নাও' । সহজ সাবলিল আন্তরিকতায় ঘটনা ও ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছিলেন কবি তাই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল অতলান্ত জীবনবোধের কাব্যভাষ্য ।

তাঁর কবিতা বোঝার আগে আমি বুঝতে চাইবো মানুষ দিনেশ দাসকে । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের উক্তি শিরোধার্য করি " কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ । কবিতা দর্পণ মাত্র - তাহার ভেতর কবির ছায়া আছে" । দিনেশ দাস এক উত্তাল সময়ের কবি , এক সংকট কালের কবিও বটে । বিশ্বের তাবৎ মহৎ সৃষ্টিই তো রচিত হয় সংকট কালেই । কবির প্রথম কবিতা 'শ্রাবণে' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩এ 'দেশ' পত্রিকায়, একুশ বছর বয়সে, আর শেষ কাব্য গ্রন্থ 'রাম গেছে বনবাসে' প্রকাশিত হয় ১৯৮১তে । ১৯৮২তে এই গ্রন্থটির জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং ১৯৮৫র ১৩ই মার্চ প্রয়াণ বাহাত্তর বছর বয়সে । ১৯১৩ থেকে ১৯৮৫ এই বিস্তীর্ণ সময় কালে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছিল কবিকে, নির্মাণ করেছিল 'কবি দিনেশ দাস'কে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের বছর কবির জন্ম। চারবছর বয়সে ঘটে গিয়েছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । নিতান্ত কৈশোরে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত বিপ্লবী সমতির সঙ্গে । ১৯৩০এ এপারে গান্ধীজির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ওপারে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন । সেই অগ্নি সময়ে কবি যুক্ত হলেন গান্ধীজির আদর্শে লবণ সত্যাগ্রহে । মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন বটে কিন্তু পড়াশোনার ধারাবাহিকতায় কিছু সময়ের ছেদ পড়লো । অনেক দেরিতে ভর্তি হলেন আশুতোষ কলেজে, সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে । কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম, দুটি লাইব্রেরি পরিচালনা আর সাহিত্য চর্চার কাজে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর বি এ পরীক্ষা দেওয়া হল না । অসন্তুষ্ট পিতা চাইলেন পুত্র তবে

চাকুরী করুক , কবি সম্মত হলেন না ইংরাজ সরকারের চাকুরী করতে । কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন কার্শিয়াং এ । সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেন , প্রথমে গৃহ শিক্ষকতা ও পরে একটা চাকুরী, চা বাগানে । সেখানে চা বাগানের কুলি-কামিনদের জীবন যাত্রা নিবিড় ভাবে জানার সুবাদে কবির মোহ ভঙ্গ হ'ল গান্ধীবাদ থেকে । ১৯৩৬এ আবার কলকাতায় ফিরে এলেন । কলকাতায় ফিরে আবার তিনি কলেজে ভর্তি এবং স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন । এই সময়েই দিনেশ দাস দীক্ষিত হলেন মার্কসবাদ'এ । ১৯৩৭এ লিখলেন 'কাস্তে' –

বেয়োনেট হোক যত ধারালো

কাস্তেটা শাণ দিও বন্ধু ।

শেল আর বম হোক ভারালো

কাস্তেটা শাণ দিও বন্ধু ।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি

তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?

চাঁদের শতক আজ নহে তো

এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে" ।.....

এই কবিতাটি আধুনিক বাংলা কবিতার এক মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় আর কবি হয়ে ওঠেন মেহনতী মানুষের জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র ।

১৯৩৩ এ কুড়ি বছর বয়সে স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'শ্রাবণে' প্রকাশ হবার সময় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এসে গেছে নতুনতর কাব্যভাবনার কাল – সূচনা হয়েছে রবীন্দ্র-প্রভাব বলয়ের বাইরে বাংলা কবিতার নতুনতর ভুবন 'কল্লোল গোষ্ঠীর নেতৃত্বে । সেটা বাংলা কবিতায়

বিষয় ভাবনার পালা বদলের সময়কালও বটে। চিরাচরিত প্রেম এবং প্রকৃতি থেকে সরে এসে সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা কবিতা। ১৯৩৭এ চব্বিশ বছর বয়সে যখন 'কাস্তে' লিখলেন তখন বাঙালির সমাজ চিন্তা-চেতনায় আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি অন্যদিকে বিশ্বজোড়া শিল্পী- সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন। ১৯৩৬এ বাংলায় যাত্রা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আশির্বাদ নিয়ে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'র। দিনেশ দাসের কাব্যচেতনা পরিপুষ্ট হ'ল এই তোলপাড় সময়ের আবহে।

১৯৪১এ প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা'। ১৯৪২-৪৭এ উত্তাল ভারত। একদিকে ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ, আর একদিকে আজাদহিন্দ ফৌজের সংগ্রাম। ৪৩এ পঞ্চাশে মন্বন্তরে, কলকাতার ফুটপাথে মৃত্যুর মিছিল ৪৬এর নৌ বিদ্রোহ, ১৯৪৭এ দেশভাগ ও খন্ডিত স্বাধীনতা। প্রতিটি ঘটনার ছায়াপাত ঘটলো তাঁর কবিতায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কলকাতার রাস্তায় মৃত্যুর মিছিল দেখে কবি লিখলেন 'ডাস্টবিন' 'ভুখামিছিল', 'গ্লানি' 'নববর্ষের ভোজ'। কবির কলমে ধ্বনিত হ'ল পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার , তাঁর কবিতা হয়ে উঠলো সময়ের দলিল। ৪৮এ গান্ধিজির হত্যাকে মনে রেখে লিখলেন 'শেষ ক্ষমা','স্বর্ণভস্ম' 'পূণর্জন্ম'। লিখলেন –

"কোটি কোটি লাঙলের ভার নিয়ে হাঁটো একা একা,

তুমি বলেছিলে খালি

দিল্লি নয় চলো নোয়াখালি" (পূণর্জন্ম)।

কবি নিজে যেমন এক অস্থির সময়ের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর ব্যক্তি জীবনেও ছিল নানান অস্থিরতা। ব্যাঙ্কের চাকুরী ত্যাগ করে পত্রিকা সম্পাদনা, কিছুদিন চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন সহকারী পরিচালক রূপে। সে কাজ তাঁর ভালো লাগেনি। অতঃপর কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে হাওড়ার নির্জন দেউলপুর গ্রামে একটি স্কুলে পধান শিক্ষকের চাকুরী নিলেন। আবার একবছর পরে কলকাতায় ফিরে এলেন। যোগ দিলেন চেতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক রূপে। এই পর্বে কবি অনেক শান্ত সমাহিত। তাঁর কবি মানসেরও দিক পরিবর্তন ঘটে এই সময়কালে। এই পর্বের কবিতাগুলি নিয়ে ১৯৫৪ তে প্রকাশিত হ'ল কাব্যগ্রন্থ 'অহল্যা' , যেটি সম্পর্কে অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশ কবিকে এক পত্রে লিখেছিলেন "অহল্যা'কে আপনি আধুনিক যুগের বা সনাতন পৃথিবীর মানবের ব্যথিত শিলীভূত প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব..."।

সব মহৎ সাহিত্যই সময়ের দলিল। আজ – একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমরাও তো এক বিপন্ন, বিপর্যস্ত সময়ের সাক্ষী। এই বিপন্ন সময়ের দলিল যারা রচনা করবেন কবিতায় তাদের দিনেশ দাসকে জানতেই হবে, অবগাহন করতেই হবে তাঁর কবিতায়। প্রয়াত সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছিলেন "স্বচ্ছন্দে তাঁর কবিতার কাকচক্ষু জলে অবগাহন করা যায়। চারপাশে ঘটছে, ঘর আর বাইরের টানা-পোড়েন, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব, জীবন আর মৃত্যু – কবিতায় সবই আছে। সেইসঙ্গে আছে বেদনাবিধুর সেই মন যার হাতে ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়..."

দিনেশ দাস সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন , কিন্তু কখনো কোন দলীয় আনুগত্যে নিজেকে বাঁধেন নি। তার কবিতায় শুধু শোষণ-পীড়নের প্রতি কুণ্ঠাহীন ধিক্কার, আর জীবনের মিছিল তাঁর কবিতায়। কবি তাঁর অর্ধ শতাব্দীর কাব্য পরিক্রমার সারাৎসার লিখেছেন তাঁরই পংক্তিতে -

"কবিতার ভেতরেই আমার শ্রেণীর পরিচয়।

আমার কবিতা একযোগে।

গান, স্লোগান, মেসিনগান"।

মৃতুর দু'বছর আগে কবি লিখেছিলেন

"..... মনে হয় আকাশে বাতাসে চারপাশে কোথাও ভয় উড়ছে।

এইসব অকারণ ভয়ের নাড়ীভুঁড়ি ছিড়ে

কবে ভোরের আলোয় আমাদের জন্মান্তর হবে –

সকালের সূর্য ফেটে পড়বে ডালিমের মত ?"(নোটবুকঃ১৯৮৩)।

এই জিজ্ঞাসা তো আমাদের এখনও। দিনেশ দাস নির্মাণ করেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের কাব্যভাষ্য।
আলোচনা ২ দিনেশ দাশ [সংগৃহীত]

কবি দীনেশ দাশ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ – ১৩ মার্চ ১৯৮৫) এক আবর্তসংকুল সময়খণ্ডের এক উল্লেখযোগ্য কবি। সে সময়কাল গত শতকের চল্লিশের দশক। সে ছিল বাংলার এক দুঃস্বপ্নের সময়। ভীষ্ম পিতামহের মতো বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে দীর্ঘ প্রতিপালনের পর কবিগুরু প্রয়াত হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষ একেবারে সদর দরজায় এসে হানা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে (পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে কুখ্যাত) কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তাড় পর ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও স্বাধীনতা ও দেশ বিভাজনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় মাত্র পনেরো বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সাময়িক ভাবে লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। এক বছর বাদে আবার শিক্ষার জগতে ফিরে এসে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২তে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে বিএ ক্লাসে ভর্তি হলেও সেই বিপ্লবী আন্দোলন ও সাহিত্য চর্চার জন্য গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারলেন না। ১৯৩৩ সালে দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে খয়েরবাড়ি চা বাগানে চাকরির সূত্রে কারশিয়াং চলে আসেন। সেখানে গান্ধীবাদী মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে বানপন্থী মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে মার্ক্স, এঙ্গেলস, রালফ ফক্সের রচনা পাঠ করে এক নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই চিন্তামানসই তাঁর কবিতাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে আমৃত্যু। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়াজাগানো ‘কাস্তে’ কবিতা। এই কবিতাটি আধুনিক বাংলা কবিতার এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং তিনি প্রায় রাতারাতি মেহনতী মানুষের জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। ‘কাস্তে’ কবিতায় শুক্ল পক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদটাকে তিনি শ্রমজীবী কৃষকের ফসল কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন। যে চাঁদ এত কাল কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্যের লাবণ্যময় প্রতীক ছিল তাকে তিনি খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুললেন। এমন একটি বৈপ্লবিক চিন্তার তিনিই পথিকৃৎ।

*

১৯২১এ ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর কাজী নজরুল ইসলাম আপামর বাঙালির কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ অভিধায় । নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এমন ব্যাপার ঘটেছে আর মাত্র একজনে ক্ষেত্রে – তিনি দিনেশ দাস । ১৯৩৮এ শারদসংখ্যা ‘আনন্দ বাজার’এ ‘কাস্তে’ কবিতাটি প্রকাশের পর, তখন পঁচিশ বছরের নবীন কবি দিনেশ দাস রাতারাতি বাঙ্গালির কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন ‘কাস্তে কবি’ নামে । অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ‘কাস্তে’ কবিতার সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি ‘এ যুগের চাঁদ হ’ল কাস্তে’ উদ্ধৃত করে দুটি কবিতা লিখলেন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ ‘পত্রিকায় , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন ছোট গল্প । আমরা অতয়েব বুঝতে পারি বাংলা সাহিত্যের পাঠক জনমানসকে কি প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছিল একটি পাঁচ স্তবকে কুড়ি পংক্তির কবিতা । আজও – রচনার ছিয়াত্তর বছর

পরেও ‘কাস্তে’ কবিতার কুড়িটি পংক্তি নতুনতর জীবনের বোধের আকাঙ্খায় থাকা মানুষের মনকে একই ভাবে আন্দোলিত করে। এখনও এই কবিতাটি নিয়ে গান করেন, দেওয়ালে পোষ্টার সাঁটেন পীড়িত মানুষের কোন সংগঠন, তাঁর কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করেন । কোন যাদুতে এমন সম্ভব ? অনেক পরে, জীবনের উপান্তে পৌঁছে কবি নিজেই শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন এই ভাবে –“আজ এই মহা দুর্যোগের দিনে এখনো আমি বিশ্বাস করি স্রষ্টা ও শিল্পীরাই এযুগের শেষ যাদুকর । ‘কাস্তে’ কবিতায় শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদটাকে তিনি শ্রমজীবী কৃষকের ফসল-কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেন । কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্য ও লাবণ্যের প্রতীক চাঁদকে তিনি খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুললেন। চাঁদের উপমায় আর এক চিরস্মরণীয় কাব্য পংক্তি সুকান্ত ভট্টাচার্যর ‘পূর্ণীমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’ । ১৯৩৭এ দিনেশ দাস যখন ‘কাস্তে’ লিখলেন, সুকান্ত তখন ১১ বছরের বালক।

দিনেশ দাস’এর আর একটি পংক্তি বোধ করি ‘কাস্তে’র সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটির চেয়েও জনপ্রিয় – অনন্তকাল ধরে উচ্চারিত হবে ১৯৫১তে লেখা ‘অহল্যা’ কাব্যগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত ‘প্রণমি’ কবিতার শেষ স্তবকের চারটি পংক্তি “আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায় / ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম, / তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা /কোনখানে রাখবো প্রণাম” । সম্প্রতি কোন এক তরুণ আলোচকের কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করা মন্তব্য দেখেছিলাম যে ‘পাঠককে শব্দের অর্থ আবিষ্কার করতে হবে , সহজ শব্দ খুঁজলে আর কবিতা পড়া কেন ? টিভি সিরিয়াল দেখো’ । আমার বলতে ইচ্ছা করে - ‘বাপু হে, আগে দু এক ছত্র দিনেশ দাস পড়ে নাও’ । সহজ সাবলিল আন্তরিকতায় ঘটনা ও ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছিলেন কবি তাই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল অতলান্ত জীবনবোধের কাব্যভাষ্য।

তাঁর কবিতা বোঝার আগে আমি বুঝতে চাইবো মানুষ দিনেশ দাসকে । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের উক্তি শিরোধার্য করি “ কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ । কবিতা দর্পণ মাত্র - তাহার ভেতর কবির ছায়া আছে” । দিনেশ দাস এক উত্তাল সময়ের কবি , এক সংকট কালের কবিও বটে । বিশ্বের তাবৎ মহৎ সৃষ্টিই তো রচিত হয় সংকট কালেই । কবির প্রথম কবিতা ‘শ্রাবণে’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩এ ‘দেশ’ পত্রিকায়, একুশ বছর বয়সে, আর শেষ কাব্য গ্রন্থ ‘রাম গেছে বনবাসে’ প্রকাশিত হয় ১৯৮১তে । ১৯৮২তে এই গ্রন্থটির জন্য ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ এবং ১৯৮৫র ১৩ই মার্চ প্রয়াণ বাহাত্তর বছর বয়সে। ১৯১৩ থেকে ১৯৮৫ এই বিস্তীর্ণ সময় কালে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছিল কবিকে, নির্মাণ করেছিল ‘কবি দিনেশ দাস’কে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের বছর কবির জন্ম। চারবছর বয়সে ঘটে গিয়েছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । নিতান্ত কৈশোরে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত বিপ্লবী সমতির সঙ্গে। ১৯৩০এ এপারে গান্ধীজির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ওপারে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। সেই অগ্নি

সময়ে কবি যুক্ত হলেন গান্ধীজির আদর্শে লবণ সত্যাগ্রহে। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন বটে কিন্তু পড়াশোনার ধারাবাহিকতায় কিছু সময়ের ছেদ পড়লো। অনেক দেরিতে ভর্তি হলেন আশুতোষ কলেজে, সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম, দুটি লাইব্রেরি পরিচালনা আর সাহিত্য চর্চার কাজে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর বি এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। অসন্তুষ্ট পিতা চাইলেন পুত্র তবে চাকুরী করুক , কবি সম্মত হলেন না ইংরাজ সরকারের চাকুরী করতে। কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন কার্শিয়াং এ। সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেন , প্রথমে গৃহ শিক্ষকতা ও পরে একটা চাকুরী, চা বাগানে। সেখানে চা বাগানের কুলি-কামিনদের জীবন যাত্রা নিবিড় ভাবে জানার সুবাদে কবির মোহ ভঙ্গ হ'ল গান্ধীবাদ থেকে। ১৯৩৬এ আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় ফিরে আবার তিনি কলেজে ভর্তি এবং স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়েই দিনেশ দাস দীক্ষিত হলেন মার্কসবাদ'এ। ১৯৩৭এ লিখলেন 'কাস্তে' –

বেয়োনেট হোক যত ধারালো
কাস্তেটা শাণ দিও বন্ধু ।
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শাণ দিও বন্ধু।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে" ।.....

এই কবিতাটি আধুনিক বাংলা কবিতার এক মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় আর কবি হয়ে ওঠেন মেহনতী মানুষের জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র।

১৯৩৩ এ কুড়ি বছর বয়সে স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'শ্রাবণে' প্রকাশ হবার সময় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এসে গেছে নতুনতর কাব্যভাবনার কাল – সূচনা হয়েছে রবীন্দ্র-প্রভাব বলয়ের বাইরে বাংলা কবিতার নতুনতর ভুবন 'কল্লোল গোষ্ঠীর নেতৃত্বে। সেটা বাংলা কবিতায় বিষয় ভাবনার পালা বদলের সময়কালও বটে। চিরাচরিত প্রেম এবং প্রকৃতি থেকে সরে এসে সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা কবিতা। ১৯৩৭এ চব্বিশ বছর বয়সে যখন 'কাস্তে' লিখলেন তখন বাঙালির সমাজ চিন্তা-চেতনায় আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি অন্যদিকে বিশ্বজোড়া শিল্পী- সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন। ১৯৩৬এ বাংলায় যাত্রা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আশির্বাদ নিয়ে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'র। দিনেশ দাসের কাব্যচেতনা পরিপুষ্ট হ'ল এই তোলপাড় সময়ের আবহে।

১৯৪১এ প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' । ১৯৪২-৪৭এ উত্তাল ভারত । একদিকে ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ, আর একদিকে আজাদহিন্দ ফৌজের সংগ্রাম । ৪৩এ পঞ্চাশে মন্বন্তরে, কলকাতার ফুটপাথে মৃত্যুর মিছিল ৪৬এর নৌ বিদ্রোহ, ১৯৪৭এ দেশভাগ ও খন্ডিত স্বাধীনতা । প্রতিটি ঘটনার ছায়াপাত ঘটলো তাঁর কবিতায় । পঞ্চাশের মন্বন্তরে কলকাতার রাস্তায় মৃত্যুর মিছিল দেখে কবি লিখলেন 'ডাস্টবিন' 'ভুখামিছিল', 'গ্লানি' 'নববর্ষের ভোজ'। কবির কলমে ধ্বনিত হ'ল পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার , তাঁর কবিতা হয়ে উঠলো সময়ের দলিল । ৪৮এ গান্ধিজির হত্যাকে মনে রেখে লিখলেন 'শেষ ক্ষমা','স্বর্ণভস্ম' 'পূণর্জন্ম' । লিখলেন –

"কোটি কোটি লাঙলের ভার নিয়ে হাঁটো একা একা,
তুমি বলেছিলে খালি
দিল্লি নয় চলো নোয়াখালি" (পূণর্জন্ম) ।

কবি নিজে যেমন এক অস্থির সময়ের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর ব্যক্তি জীবনেও ছিল নানান অস্থিরতা । ব্যাঙ্কের চাকুরী ত্যাগ করে পত্রিকা সম্পাদনা, কিছুদিন চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন সহকারী পরিচালক রূপে । সে কাজ তাঁর ভালো লাগেনি । অতঃপর কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে হাওড়ার নির্জন দেউলপুর গ্রামে একটি স্কুলে পধান শিক্ষকের চাকুরী নিলেন । আবার একবছর পরে কলকাতায় ফিরে এলেন । যোগ দিলেন চেতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক রূপে । এই পর্বে কবি অনেক শান্ত সমাহিত । তাঁর কবি মানসেরও দিক পরিবর্তন ঘটে এই সময়কালে । এই পর্বের কবিতাগুলি নিয়ে ১৯৫৪ তে প্রকাশিত হ'ল কাব্যগ্রন্থ 'অহল্যা' , যেটি সম্পর্কে অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশ কবিকে এক পত্রে লিখেছিলেন "অহল্যা'কে আপনি আধুনিক যুগের বা সনাতন পৃথিবীর মানবের ব্যথিত শিলীভূত প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব..." ।

সব মহৎ সাহিত্যই সময়ের দলিল । আজ – একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমরাও তো এক বিপন্ন, বিপর্যস্ত সময়ের সাক্ষী । এই বিপন্ন সময়ের দলিল যারা রচনা করবেন কবিতায় তাদের দিনেশ দাসকে জানতেই হবে, অবগাহন করতেই হবে তাঁর কবিতায় । প্রয়াত সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছিলেন "স্বচ্ছন্দে তাঁর কবিতার কাকচক্ষু জলে অবগাহন করা যায় । চারপাশে ঘটছে, ঘর আর বাইরের টানা-পোড়েন, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব, জীবন আর মৃত্যু – কবিতায় সবই আছে । সেইসঙ্গে আছে বেদনাবিধুর সেই মন যার হাতে ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়..."

দিনেশ দাস সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন , কিন্তু কখনো কোন দলীয় আনুগত্যে নিজেকে বাঁধেন নি । তার কবিতায় শুধু শোষণ-পীড়নের প্রতি কুণ্ঠাহীন ধিক্কার, আর জীবনের মিছিল তাঁর কবিতায় । কবি তাঁর অর্ধ শতাব্দীর কাব্য পরিক্রমার সারাৎসার লিখেছেন তাঁরই পংক্তিতে -

"কবিতার ভেতরেই আমার শ্রেণীর পরিচয় ।
আমার কবিতা একযোগে ।
গান, স্লোগান, মেসিনগান" ।

মৃতুর দু'বছর আগে কবি লিখেছিলেন

"..... মনে হয় আকাশে বাতাসে চারপাশে কোথাও ভয় উড়ছে ।
এইসব অকারণ ভয়ের নাড়ীভুঁড়ি ছিড়ে
কবে ভোরের আলোয় আমাদের জন্মান্তর হবে –
সকালের সূর্য ফেটে পড়বে ডালিমের মত ?"(নোটবুকঃ১৯৮৩) ।

*

লেখক সমবায় (১৯৫৯) এবং ভারবী (১৯৭২) প্রকাশিত দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের প্রত্যেকটির ভূমিকায় কবি দীনেশ দাস কবির ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর কাব্যজীবনের গভীর সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন— 'প্রতিটি কবিকর্মকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখাই যুক্তিসংগত। তবে কবির জীবন যেমন তাঁর কাব্যে প্রকাশিত তেমনই তাঁর কাব্যও অনেক সময় তার জীবনের মধ্যে রূপায়িত।' একই প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর 'কাচের মানুষ' কাব্যগ্রন্থে 'কাব্যচিন্তা; কবিতাগুচ্ছের 'জীবন ও সাহিত্য' শিরোনামে লেখা লাইনে—

জানতাম, জীবনের প্রতিবিম্ব/ উপন্যাস কবিতা সম্ভার।/ সাহিত্যের প্রতিবিম্ব এ জীবন কিনা/ মনে মনে ভাবি 'বারবার'। কবির শততম জন্মবর্ষে তাঁকে বুঝতে তাই প্রথমে তাঁর কাব্যময় জীবনের রূপরেখা পেশ করা জরুরী।

আদি গঙ্গার তীরে আলিপুরে চেতলা অঞ্চলে (৬৫ এফ জয়নুদ্দি মিস্ত্রি লেন, কলি-২৭) তাঁর মাতুলালয়ে ১৯১৩সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর কবির জন্ম। পিতা হৃষিকেশ দাস, মাতা কাত্যায়নী দেবী। কবির দুটি ভাই শৈলেন ও মনোজ এবং এক বোন জয়শ্রী দাস। বারো বছর বয়সে ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় কবি ছড়া মেলাতে শুরু করেন। কিন্তু নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় জনৈক বর্মনদার নেতৃত্বে গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। অন্যদিকে গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে, তথাপি ১৯৩০সালে সসম্মানে ম্যাট্রিক ও ১৯৩২সালে আই-এ পাস করেন, ১৯৩৩-৩৪ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে ১৯৩৪সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'শ্রাবণে' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এদিকে পুরনো বিপ্লবী সমিতির কাজ ও কাব্যসাহিত্য চর্চার চাপে বি এ পরীক্ষা দেওয়া হলো না। বাবা সরকারী চাকরি নিতে বলায় দ্বিমত হয়ে কবি ১৯৩৫সালে কলকাতা ছেড়ে কার্শিয়াং-এর খয়াবাড়ি চা বাগানে চাকরি নিয়ে চলে যান। সেখানে চা বাগানের নিপীড়িত কুলিদের বঞ্চনা ও দারিদ্র্য মোচনে গান্ধীবাদী অহিংস পথের কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয়াপন্ন হয়ে উঠেন। পরের বছর ১৯৩৬কবি কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় ফিরে অন্যান্য কবিদের মতো তিনি গদ্যরীতিতে কাব্যরচনায় যুক্ত হয়ে লিখলেন ‘প্রথমবৃষ্টির ফোঁটা’, ‘মৌমাছি’, ‘নখ’, ‘হাই’, ‘চায়ের কাপে’- সহ নানা কবিতা, তখনও কবির কোন সংকলন প্রকাশিত না হওয়া সত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাংলা কাব্য পরিচয়’ সংকলন গ্রন্থে ‘মৌমাছি’ অন্তর্ভুক্ত করেন। একই সময়ে তখনকার কলকাতার সর্বত্র সাম্যবাদ ও কমিউনিজমের আলোচনার পরিবেশে কবিও মার্কস, এঙ্গেলসের পাশাপাশি র‍্যালফ্ ফকস্ প্রমুখ সাম্যবাদী ব্যক্তিদের দর্শন ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। এরই ফলে কাব্যজগতে তিনিও রোমান্টিসিজমের নদী পেরিয়ে ধীরে ধীরে বাস্তবতার ডাঙায় উঠে এলেন। এই সময় ফ্যাসিবাদের গুরু মুসোলিনি ইথিওপিয়ায় বোমা ফেলে হাজার মানুষকে মেরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করেন। আর হিটলারের উত্থানের শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আগাম পদধ্বনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র শ্রমিক কৃষক সকল মেহনতী জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ একে পরাস্ত করতে পারে এই বিশ্বাসে স্থিত হয়ে লিখলেন ১৯৩৭সালে ‘কাস্তে’, (কবিতা ১৯৪২)। আহ্বান করলেন সকল শ্রমজীবীদের হাতিয়ারের প্রতীক হিসাবে কাস্তে শান দিতে। এই কবিতা মুহূর্তে ইতিহাস রচনা করল, যেন সমাজমানসের অন্তঃস্থলের একান্ত চাহিদা পূরণ হলো। প্রভাবিত হলেন পাঠকসহ কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। অগ্রজ বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ‘কাস্তে’র লাইনকে শিরোনাম করে কাব্য রচনা করলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘অলকা’ পত্রিকায় ওই নামে গল্প লিখলেন। ছোট বড় আরও অনেকে কবিতা রচনা করলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে ধোঁকা দিতে পরিকল্পিতভাবে হাতুড়ি বর্জিত করা সত্ত্বেও রাজরোষের ভয়ে এক বছর ‘কাস্তে’ ছাপার মুখ দেখেনি। ১৯৩৮এ অবশেষে কবিবন্ধু অরুণ মিত্রের সৌজন্যে তা আনন্দবাজার শারদীয়ায় প্রকাশিত হয়। কবিও নতুন করে কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৩৮ এ বি এ পাস করেন। কিন্তু ব্রিটিশরাজের পুলিস তাঁর বাসস্থানে তল্লাশি করে এবং তাকে লর্ড সিন্‌হা রোডে আটকে রাখে।

১৯৩৯সালে ঢাকা নিবাসী উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী যামিনী বিশ্বাসের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতি মণিকা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ঐ সময়েই তিনি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যা ঙ্কে (পরে নাম হয় এল আই সি) কাজে যোগ দেন। ১৯৪০-৪১সালে বাংলায় বোমাতঙ্ক, ১৯৪২-এ মন্বন্তর, একটু ফ্যানের জন্য মৃত্যুমিছিল কবির হৃদয় বিদীর্ণ করলো। তিনি লিখলেন ‘গ্লানি’, ‘ডাস্টবিন’, ‘ভুখ মিছিল’, ‘বামপন্থী’। অন্যদিকে ‘মজুতদারী’, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লিখলেন ‘ক্লাইভ স্ট্রিট’। ‘ভুখ মিছিলের’ (১৯৪৪) থেকে ‘পঞ্চাশের মন্নন্তর’ কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আকাল’ কাব্যসংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

চাকরি জীবনের সাত বছর পর ১৯৪৬সালে কর্মস্থলে ইউনিয়ন গড়তে গিয়ে তিনি বাধা পেয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন। এই সময় প্রথমে দৈনিক কৃষক ও মাতৃভূমি কাগজে কিছুদিন কাজ করেন। চলচিত্রে গীতিকার ও সহ পরিচালকের কাজেও যুক্ত হন। কিন্তু কোন কাজই তাঁর মনঃপুত হয়নি। অর্থাভাব, দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সৎ, দৃঢ়চিত্ত আত্মসম্মানবোধে অবিচল বলে কখনও কারুর অযাচিত অনুগ্রহ লাভের জন্য মাথা নোয়াননি।

ইতোমধ্যে খণ্ডিত স্বাধীনতা, ভ্রাতৃদাঙ্গা, সর্বশেষে গান্ধীজীর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। তিনি কলকাতা ছেড়ে হাওড়া জেলার গ্রামে দেউলপুর বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ নিয়ে ১৯৪৮সালে চলে যান। সেখানে তিনি এক বছর ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয় ও গ্রামের মানুষ তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধায় আজও স্মরণে রেখেছেন। এই সময় নতুন ভাবনা বোধের কবিতা লেখেন, উল্লেখযোগ্য হলো 'দেউলপুর', 'ঘুঘু ডাকে', 'শেষ ক্ষমা', 'স্বর্ণভস্ম' (দীনেশ দাসের কবিতা ১৯৫১)। এক বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে চেতলা বয়েজ স্কুলে বাংলার শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। তাঁর লেখায় নতুন অনুভাবনার সঙ্গে প্রতীক ও ব্যঞ্জনার চরিত্রে গভীরতা ও মগ্নতার লক্ষণ ধরা পড়ে। এই সময়ের (অহল্যা ১৯৫৪) তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অহল্যা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রণমি'। সাথে সাথে গরিব নিম্নবিত্ত মানুষের বেদনা ও আন্দোলনের সমব্যথী হয়ে লিখলেন 'শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৩', 'শিক্ষক ধর্মঘট ১৯৫৪'। ইতিমধ্যে মাতুলালয় ছেড়ে অন্যত্র কিছুকাল বাস করেন। পরে গোপালনগরে ৪/১ আফতাব মস্ক লেন ঠিকানায় পিতৃগৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কবির দুই পুত্র শান্তনু ও ভারবী এবং এক কন্যা জোনাকি।

১৯৫৯সালে প্রকাশিত প্রথম শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন 'উল্টোরথ' পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৯৬১ ও ১৯৭৪সালে দিল্লিতে জাতীয় কবি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কবি রূপে আমন্ত্রিত হন। ১৯৬১-তে আর্থারাইটিস রোগে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর 'কাচের মানুষ' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ১৯৭২-এ 'অসংগতি' এবং একই বছরে শ্রেষ্ঠ কবিতা দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৭৫-এ নতুন করে 'কাস্তে' নামে একটি আলাদা সংকলন প্রকাশ করে নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকার শপথ নেন। ১৯৮০সালে কবিকে নজরুল আকাদেমি প্রথম নজরুল পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। আর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'রাম গেছে বনবাসে' ১৯৮২সালেই রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

১৯৮৪তে কবির 'কাব্যসমগ্র' প্রকাশের পর তাঁর স্বাস্থের ক্রমাবনতি ঘটে, সে অবস্থায় লিখলেন 'হার্ট অ্যাটাক', 'জার্নাল', 'হাসপাতাল' এবং 'এবার ঘুম'। ১৯৮৫সালে ১৩ই মার্চ কবি গোপালনগরের বাসভবনে চিরঘুমে বিদায় নিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'কাস্তে' কবিতায় 'হাতুড়ি' রাখা হয়নি ব্রিটিশকে ধোঁকা দিতে, কবি একথা বার বার বলেছেন, ফ্যাসিবাদকে তখনও অনেক বুদ্ধিজীবী না বুঝে প্রশংসা করেছেন, কেউ কেউ মুসোলিনি, পরে হিটলারকে ভগবানের অবতার বলছেন, কবির ভাষায় 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনে সংশয়, — It is difficult to choose between, communism and fascism. সেই ভীত ত্রস্ত সংশায়িত যুগে স্থিরবিশ্বাসের কবিতা 'কাস্তে'। বলতে চেয়েছিলুম ফ্যাসিস্তদের বেয়োনেট যত তীক্ষ্ম হ'ক না কেন, কাস্তে হাতুড়ি অর্থাৎ জনগণের শক্তির সঙ্গে তারা কিছুতেই পারবে না।' (কাস্তে ১৯৭৫ সংস্করণের ভূমিকা থেকে।)

কালযুগের ফসল, ধ্রুপদী উপাদানের অভাব বা মার্কসবাদের ধারণায় শিল্প সাহিত্যের প্রসঙ্গে তল উপরিতলের সরলীকৃত বিতর্ক যাঁরা হাজির করেন, তাঁরাও কেউ অস্বীকার করেননি এই কবিতার অসাধারণ শব্দ চয়ন, ছন্দ, স্তবক, বিন্যাস এবং অপূর্ব ব্যাঞ্জনাসমৃদ্ধ গীতিমুখর গঠনশৈলী, কালের আহ্বানে লিখিত

হলেও এই কবিতা কালজয়ী তার কাব্য সুষমায়। এ যেন মাও জে দঙ তাঁর ইয়েনান বক্তৃতামালায় ঠিক যেমনটি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন— রাজনৈতিক উপাদান নিয়ে গড়া শিল্পরূপের সর্বোত্তম সম্ভব বিকাশ। (the unity of revolutionary political content and the highest possible perfection of artistic form).

কবির কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বে দেখি চল্লিশের দশকের শুরুতে মন্বন্তর, কলকাতায় একটু ফ্যানের জন্য গ্রাম থেকে ছিন্নমূল ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারে সমব্যথী হয়ে প্রকাশিত হলো 'ভুখ মিছিলে'র সেইসব হৃদয় বিদারক কবিতার স্তবকগুলি— 'এই দারুণ ক্রন্দনেই/যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?/তবু আকাশ স্তব্ধ নীল/নিম্নে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় মৌন মুখ ভুখা মিছিল।' বা 'বেঁচে আছি আমি/ এর চেয়ে নেই লজ্জা, নেই বড় গ্লানি।' (গ্লানি) আর 'ডাস্টবিন' কবিতায় লিখলেন, 'এই যে খুনে সভ্যতা/অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা।'

কবির দেউলপুর ও পরবর্তী পর্যায়ে নানা অভিজ্ঞতার ভিন্নধর্মী কবিতা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির কিছু স্মরণযোগ্য লাইন উল্লেখ করি— 'যে প্রাণ দেউলপুরে সে প্রাণই আমার' (দেউলপুর)। আর সবচাইতে স্মরণীয় বোধহয় এযাবৎ রবীন্দ্রস্মরণে লেখা 'প্রণমি' (২৫শে বৈশাখ) এর সর্বোৎকৃষ্ট চারটি লাইন— 'আকাশে বরুণে দূরে স্ফটিক ফেনায়/ ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম/ তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা/ কোনখানে রাখব প্রণাম।'

ষাটের দশকে সমাজের অবক্ষয়, সত্তরের দশকে সন্ত্রাস জরুরী অবস্থা তাঁকে পীড়া দেয়। এইসব অবস্থানে জীবনের নানা বোধের সঞ্চারের মধ্যেও কবি সর্বহারা, গরিব নিম্নবিত্তের বেদনা ও লড়াই ও পরিচয়কে ভোলেননি। মানুষের মহাকাশ যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন, 'এতে কি দূর হবে পৃথিবীর দুঃখ/ মানুষের ভাত রুটির কান্না।' 'লেলিন শতবর্ষে কোন চাষি' কবিতায় নিজেকে হাওড়া জেলার কোনে কাষ্ঠস্যাংড়া গ্রামের চাষিপাড়ার চূড়ামণি দলুই পরিচয় দিয়ে লিখেছেন— 'কেটে যাবে এই অমাবস্যার ঘোর/ দেখা যাবে ঠিক/ কাকের মুখেতে বটফল যেন/ টকটকে রাঙা ভোর।' আর 'গান, স্লোগান, মেশিনগান' কবিতায় সদর্প ঘোষণা 'আমি কবি চিরদিনই সর্বহারা।'

প্রথমেই বলেছিলাম দীনেশ দাসের জীবন যেমন তাঁর কাব্যে, তেমনি তাঁর কাব্য, তাঁর জীবনে প্রতিপদে প্রতিফলিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বস্তির নিতান্ত বাস্তব জীবনে ভর করে 'কবি লেখেন' কবিতায় টিনের চালের নিচে একফালি তক্তপোষের উপর লুঙ্গি আর ফুটো গেঞ্জি পরে বিদ্যুৎবিহীন ঘরে মোমবাতির সামনে কবি অপেক্ষায় রত কখন 'হঠাৎ জ্বলে ওঠে কবির মন একটি শুচিশুভ্র শিখায়।

পঞ্চম অধ্যায়
অমিয় চক্রবর্তীর চোখে

আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত কবি-মানসের অধিকারী কবি অমিয় চক্রবর্তী ।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে এ যুগের প্রধান আধ্যাত্মিক কবি মনে হতে পারে যিনি রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার উত্তরাধিকারকে একাই বহন করে নিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু এজারা পাউণ্ডের mask-এর মতো এ তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র । নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তলায় যেমন লুকিয়ে থাকে মগ্ন শৈল ও ঘণ অরন্য,ঘূর্ণাবর্ত ও জলচর জীবের বিক্ষোভ, তেমনি এই ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গতির' কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্বজর্জর আধুনিক মানস— এক অনিকেত ছিন্নমূল সত্তা-সমন্বয় যার কাম্য কিন্তু আজও অপ্রাণজনীয়, যার আন্তর্জাতিক চেতনা বিদেশের পথেঘাটে স্বজন খুঁজে বেড়ায়— এক কথায় দুই পৃথিবী হারিয়ে যে কেবল তাদের মধ্যে পারাপার করে চলে সেতুবন্ধনের দুর্মর আশায় ।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য যে-কয়জন কৃতি সাহিত্যিক, কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং খুবই আস্থাভাজন হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি অমিয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য । শেষ জীবনে তাঁর বিদেশ ভ্রমনের সঙ্গী হিসেবে বিশেষ করে রাজনীতিক এবং শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর মতামত ও পরামর্শের ওপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন । ১৯৩০ সালে কবির ইউরোপ ও সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ ও ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমনে অমিয় চক্রবর্তী কবির সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ।

১৯৩৩ সালে অমিয়চন্দ্র উচ্চতর শিক্ষা-ও গবেষনার জন্যে বিলেতে চলে যাওয়ার পর কবি যেন বেশ কিছুটা অসহায় বোধ করতে থাকেন । এই সময়ে একটি চিঠির এক জায়গায় অমিয়চন্দ্রকে লিখেছেন :

"তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিলো যে এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিছিন্ন করা সহজ নয় । তুমি আমার অনেক করেচ, অনেক ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়েছ, তোমার সহযোগীতা আমার পক্ষে বহুমূল্য হয়েছিল সে কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না — কোনোদিন তোমার অভাব পূর্ণ হবে না ।"···(১)

পরের একটি চিঠিতে কবি এক জায়গায় অমিয়চন্দ্রকে লিখেছেন— (২-রা এপ্রিল, ১৯৩৪) :— "তোমার কথা বার বার মনে পড়ে । তুমি আমাকে যেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছিলে পেয়েছিলে, এমন কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই জন্যে আমি! তোমার পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরেছি । এ রকম সঙ্গ আমি আর কারো কাছ থেকে আশা করি নে ।"···(২)

অবশ্য অমিয়চন্দ্রের সব পরামর্শ ও মতামতকে কবি যে গ্রহণ করতে পারেন নি— বিশেষ করে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনীতিক ঘটনা ও বিষয়ে সম্পর্কে, এটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গ্রহণ করতে না পারলেও প্রায় পুত্র- প্রতিম এই অনুজ ভাবশিষ্যটির স্বতন্ত্র বিচারশক্তি ও মতামতকে কবি শ্রদ্ধা করতেন, আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ।

আধুনিক ইংরেজি-তথা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে উদাসীন ছিলেন— তা নয় । যে মূল দার্শনিক ভিত্তির ওপর আধুনিক ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তার মূল মর্মকথাটা কবি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও অনুভূতির সাহায্যে অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । অমিয়চন্দ্র আধুনিক ইংরেজি শিল্প-সাহিত্য-সম্পর্কে কবিকে অবহিত রাখার জন্যে নানান বই পত্র সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির উপরে তিনি এক জায়গায় লিখলেন (৪-ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫) — "আপনার চিঠিখানি প্রবাসী কি পরিচয়ে ছাপানো দরকার, আমাদের

লেখকদের চোখ খুলবে । আধুনিক সাহিত্যের ভিতরকার কথা এমন করে বলেছেন ।"···(৩)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি কবিতার চয়নিকা এবং collected Edition এর সম্পাদনার ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তীর ওপর পূর্ণ অধিকার দিয়ে লিখেছেন (চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড ।। পৃ- ১৫৬): "Collected Edition এ ছেঁটে ফেলার কাজে একটুও মমতা দেখিয়ো না । তোমাদের কার্ট ব্লাঁশ অধিকার দিচ্চি । আমি যা দাগ দিয়েছি তাতেও আমার মন তৃপ্তি পায় নি । লাগাও কোপ । পরিবর্তন যদি উপযুক্ত লোকের হাতে হয় কিসের আপত্তি ? তুমিই আমাকে represent করতে পারবে । তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় sturge Moore এর মত কবি যদি মাজাঘষা করেন আমি স্বয়ং থেকে তার বেশী কিছুই করতে পারি নে ।···(৪)

এর থেকেই অনুমান করা যায়, অমিয় চক্রবর্তীর সাহিত্যবোধ ও বিচারশক্তির ওপর কবির কি সুগভীর আস্থা ও ভরসা ছিলো ।

কবি অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কেএকটা জিনিস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের বাংলার নব্য এলিয়টপন্থী কবিরা যখন In Defence of Decadance -এর সাফাই গাইছেন তখন 'রবীন্দ্র-ভক্ত' ও 'রবীন্দ্র অনুসারী' কবি অমিয় চক্রবর্তী বলিষ্ঠ ঋজু কণ্ঠে সরাসরি Commitment এবং সংগ্রামী সাহিত্যের আহ্বান জানালেন । ১৯৩০ সালের ১৬ই জুলাই শ্রীনিকেতন থেকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রের এক জায়গায় কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন— "স্পেণ্ডর ও ফস্টরের দুটি চটি বই পড়লাম । আমার নিজের মত এই যে আমরা অর্থনীতি বা ধর্মনীতিতে যে দলেরই লোক হই আমাদের সেই দলাদলি-যে সাহিত্যিক বিশেষ ছাঁদে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই । রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয় । আমরা মনটা হয়তো সোশিয়ালিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে-তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শ করে না ।"···(৫)

কবির এই চিঠি পাওয়ার পর অমিয় লাহোর থেকে তার জবাবে চিঠির এক জায়গায় লিখলেন (২৬ শে জুলাই, ১৯৩৯) :-"···স্পেণ্ডর এবং ফস্টরের সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তাতে আর্ট এবং সমাজনীতির মূল তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । Antumn Journal প্রভৃতি আধুনিক কাব্যে ব্যবহারিক সাহিত্য' কতদূর সার্থকতা পেয়েছে— এদের চেষ্টার মূল্য আর্টের দিক থেকে কতখানি, তা আপনার কাছ থেকে কোনো সময়ে আরও জানতে পারলে অনেক তর্কের অবসান হোতো । আপনি বলেছেন Socialism আপনার চিন্তার রাজ্যে বড়ো আসন পেয়েছে গ্রামের কাজে শিক্ষায় শ্রীনিকেতনে তার অনেক পরিচয়— আপনার কাব্যে তার প্রভাব কীভাবে পৌঁছেচে তার বিচার সম্পূর্ণ সাহিত্যগত না হলেও আজকের দিনে তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে । এ বিচার বাহির থেকে অনেকেই করবে, ভবিষ্যতেও এই নিয়ে তর্ক চলবেই, আপনার কী মনে হয় জানলে দৃষ্টি আমাদের স্পষ্ট হত ।"···(৬)

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেই, 'অমিয়বাবু এইভাবে কবিকে নানা ভাবে প্রশ্ন করে তাঁর নিজের মুখ বা লেখনী থেকেই তার জবাব সংগ্রহ করে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হিসেবে এখানে তিনি যে ধরনের সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, সেগুলো তাঁর মৃত্যু বা তিরোধান কাল পর্যন্ত আরও সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটনা, এবং ব্যক্তির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার বা আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য সচিবেরা 'নোট' রাখতে পারতেন, তাহলে দেশবাসী অনেক বেশী উপকৃত হতো । তবু কবির জীবনের এই অন্তিম পর্বে এবং বিশ্বের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে কবির মানসিক যন্ত্রণা এবং চিন্তাভাবনার বিষয় নানা ভাবে প্রশ্ন করে অমিয় চক্রবর্তী কিছুটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন । বস্তুত, অমিয়চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের ছলেই কবি যেন তাঁর গভীর সব প্রশ্নের আলোচনা কিংবা তাঁর মানসিক উদ্বেগ এবং দুঃখ-যন্ত্রণার ভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন ।

গত তিরিশের দশক থেকেই অমিয়চন্দ্র বাংলা কাব্য-সাহিত্য সাধনায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই কাব্য-সাধনা এক অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছিলো । তাঁর প্রথম যুগের রচনা 'চেতন সাকরা' কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে খুবই সুখ্যাতি করেছিলেন । ভাবে ভঙ্গীতে শব্দচয়নে চিত্রকল্পে সেদিন এ কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর ও রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কাব্যসাধনার একটি স্বতন্ত্র সুর শোনা গিয়েছিলো । কবিতাটি তাঁর 'একুশটা' কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয় (পৌষ ১৩৪৬) । 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থ দু'খানি পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যশক্তির ও কবিসত্তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'প্রবাসী'তে (নবযুগের কাব্য' প্রবাসী-চৈত্র, ১৩৪৬) লিখলেন— ''আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে । তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় । সে বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি । তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে ।''···(৭)

রবীন্দ্রনাথের এতো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁর আশীর্বাদ পেয়েও রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হওয়াটা কম কৃতিত্বের কথা নয় । দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা সৌভাগ্যক্রমেই হোক, আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সাধনার একেবারে সূচনাকাল থেকেই তার টিকি বাঁধা ছিল বিলেতে । ইংরেজ কবিরাই ছিলেন আমাদের কবিদের আদর্শ ও প্রেরনাস্থল । সে-যুগে এর বিশেষ ভূমিকা এবং প্রয়োজনও হয়তো ছিলো । ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই বিশ্বসাহিত্যে আমাদের প্রবেশ সম্ভব হয়েছিলো ।

১৯৩০-৩১ সালে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের সচিব রূপে ভ্রমনের এবং সেই সুবাদে বার্ণাডশ' ওয়েলস, বাট্রাণ্ড, রাসেল, আইনস্টাইন, রোমাঁ রোল্যাঁ প্রমুখ বিশ্বের সুধীজনের সঙ্গে পরিচয় ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছিলো অমিয়চন্দ্রের । তিনি সে যুগের মার্কসবাদী শিবিরের 'কমিটেড' কবি না হয়েও অডেন-স্পেণ্ডারের খুবই অনুরাগী ও গুণ-গ্রাহী ছিলেন । শুধু তাই-ই না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি । সাহিত্য ও কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অমিয়চন্দ্রের মতামত ও বিচারশক্তির ওপর যতোটা ভরসা রাখতেন,ততোটা কারোর ওপরেই রাখতেন না ।

অডেন স্পেণ্ডারদের মতো অমিয় চক্রবর্তী মার্কসবাদী প্রগতি শিবিরের 'কমিটেড' লেখক ছিলেন না ঠিকই কিন্তু যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং কর্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবনই প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন । আর এর প্রধান-প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে । সে-যুগে অডেন-স্পেণ্ডররা কিংবা ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিলো সত্যি, কিন্তু মোহগ্রস্ত কিংবা বিহ্বল আত্মহারা করতে পারেনি । বস্তুত আদর্শ ও মানসিকতার দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই গুরুর পদে বরণ এবং তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন ।

অমিয় চক্রবর্তী একজন মানবতাবাদী কবি । তিনি ভালোবেসেছেন নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষকে । একথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের মহান ক্রোধ ও ঘৃনা এবং অভিসম্পাতকারী বজ্রকণ্ঠ তেমন করে তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়নি, কিন্তু উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও সহানুভূতি হৃদয় থেকে স্বতই উৎসারিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে অত্যাচারী ও শোষকদের তীব্র ঘৃনার আগুণে দগ্ধ করতে চেয়েছে । সর্বোপরি আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন ।

অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন মূলত জীবন ও মানবমুখীন কবি । মানুষ এবং জীবনও প্রকৃতিকে তিনি গভীর ভাবে ভালোবেসেছেন আর তাঁর যা কিছু কমিটমেণ্ট তা এই বিশ্বমানবের কাছেই । রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি মানুষের প্রতি কখনো আস্থা হারাননি । তাই অভেন স্পেণ্ডারদের প্রায় একই সঙ্গে যখন ত্রদেশীয় বুদ্ধদেব বসু তথা কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের পতন হলো— যখন তাঁরা তাদের শিবির ত্যাগ করে গেলেন, অমিয় চক্রবর্তী তখনও তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে স্থির ও অটল

দাঁড়িয়ে রইলেন এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে আজীবন কাব্যসাধনা করে গেছেন । প্রতিক্রিয়ার ঘূনাবর্তে পড়ে বুদ্ধদেব বসুরা তাঁদের সাহিত্যে মানুষের আদিম রিপু ও প্রবৃত্তিকে উন্মথিত করে প্রতিষ্ঠিত হবার কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করে গেলেন— এমন কি আদালতে অভিমুক্ত হলেন । অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু কোনোদিনই এই প্রতিক্রিয়ার শিকার হননি । বাতায়ন খুলে দিয়ে তিনি বাংলাসাহিত্যে নির্মল ও বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের চেষ্টা করে গেছেন আজীবন ।

১৯৩৮-৩৯ সালে কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের আক্রমণে যখন রবীন্দ্রনাথের মন সাময়িকভাবেও সোভিয়েট সরকারের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলো, যখন তিনি নাকি ডিক্টেটরী নীতির সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের শিল্প-সাহিত্য নীতির তুলনা করে প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩৪৬) অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন, অমিয়চন্দ্র কিন্তু তখন সোভিয়েট দেশ সম্পর্কে কবির সেই সাময়িক চিত্তবিরূপতাকে তীব্রতর বা স্থায়ী করার জন্যে এতটুকু সাহায্য বা ইন্ধন যোগাননি; উপরন্তু সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে সোভিয়েটের গঠনমূলক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে কবির মন প্রসন্ন করবার জন্যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন (জুলাই, ১৯৩৯) । এর ঠিক মাসখানেক পরে রুশ-জার্মান অনাক্রমন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে আমাদের প্রগতিশীল কবি তথা লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই যথেষ্ট বিভ্রান্ত হলেন । কবি সুধীন দত্তের মতো মানুষও স্ট্যালিনকে বিদ্রূপ করে কবিতা লিখে ফেললেন । তবে অমিয় চক্রবর্তী কোনদিনই এধরনের সোভিয়েট বা কমিউনিজম-বিরোধী কবিতা লেখেন নি — এটা বিশেষভাবে লক্ষনীয় ।

'কল্লোল' লেখক গোষ্ঠীর রবীন্দ্র-বিদ্রোহের কথা প্রায় সর্বজনবিদিত । শেষজীবনে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত অশালীন ও কুৎসিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ওপরে আক্রমন সজনীকান্ত দাসই তাঁর শনিবারের চিঠিতে শুরু করেন । এ অবস্থায় কবির স্নেহভাজন এবং সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তী এগিয়ে এসে 'শনিবারের চিঠি'র এই হীন ও অশলীন আক্রমনের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন । 'বিচিত্রা'র (শ্রাবণ-১৩৩৫) সাহিত্য ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর নাম যুক্ত করে বিভিন্ন বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর তরফ থেকে এমন সব ইতর ও বিশ্রী আক্রমন চালানো হয়, যা তাঁদের উভয়েরই পক্ষে চরম অসম্মান ও অবমাননাকর এবং ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিলো, আর এ ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তীর অবস্থাটাই সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠেছিলো । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের 'খাস কলমচী' 'একান্ত সচিব' ইত্যাদি অভিধা যুক্ত হয়ে অবস্থাটা এমনই দাঁড়ায় যে, এর বাইরে তাঁর কোনো স্বতন্ত্র বা ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বই ছিলো না । এইসব অপবাদকে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে উপেক্ষা করেছেন অমিয় চক্রবর্তী । ত্রিশের দশকের কল্লোলীয়দের রবীন্দ্র-বিদ্রোহ ও পরবর্তী স্বরে রবীন্দ্র-বরণের রূপ পরিবর্তনের মধ্যে একমাত্র তিনিই আপন স্বতন্ত্র বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন ।

সৃষ্টি সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীর উপলব্ধি হোলো সামঞ্জস্যবোধ । শুভ-চেতনায় বিশ্বাসী এই কবি বিশ্ববিধানের মধ্যেও একটা সু-শৃঙ্খলা দেখতে চেয়েছেন । মূলত এই কারণেই অমিয় চক্রবর্তীকে, প্রথম পাঠে, রবীন্দ্রজগতের কবি মনে হয় । জীবনের সুস্থ প্রত্যয়কে তিনি মুহূর্তের জন্যেও বিসর্জন দেয়নি । সমর সেনের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন— "অতৃপ্ত জীবনের মানসিকতা লেখকগোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়, সমস্ত মানবসভ্যতায় আজ বিচিত্র সম্ভবপরতার অন্তরে শান্তি নেই; লোকালয় এবং বৃহৎ সৃষ্টির আকাশ একই সভার অন্তর্গত অথচ জোড় মিলচে না ।···যুগের অভিজ্ঞতাকে নিষ্পলক চোখে দেখানোর উৎসাহে জীবনের অজেয় শিবিরগুলিকে সমরবাবু ভুলেছেন, অথবা যথেষ্টে জায়গা দেননি । প্রাণের সহজ আনন্দই সেই শক্তির দুর্গ ।··· (৮)

অমিয় চক্রবর্তীর এই বিশ্বাস সম্পর্কেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — "এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র । এটাই তাঁর রচনার প্রেরনা এবং অন্ত: সার, অভাব, প্রশ্ন, তর্ক, বোমা ভাঙা শহর, বাংলার দারিদ্র্য, মার্কিন সভ্যতা, প্রেমিকার বিচ্ছেদ—

এই সব কণ্টকময় জটিলতা একটি স্থির-হাঁ-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে; রক্তবীজের মতো না-য়ের গোষ্ঠী গজিয়ে উঠলেও তারা এক আরো-বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সুষমভাবে, বিনীতভাবে অবস্থান লাভ করছে, কোন দুর্জয় বিরোধের জন্ম দিতে পারছে না।···(৯)

খুবই সহজলভ্য তাঁর কবিতায় এই উক্তির সমর্থন 'খসড়া' কাব্যেই তিনি ঘোষণা করেছেন— '' মেলাবার দেব এই মাটি জুড়ে আমার বুকে''।

তাঁর বিখ্যাত 'সংগতি' কবিতাটিতে (মেলাবেন তিনি মেলাবেন) যে মিলন মন্ত্রের বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে, তাতে এ যাবৎ কাউকে সংশয়ান্বিত হতে দেখা যায়নি ।

রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদিক আনন্দ-চেতনা কখনোই তাঁর মন ছেয়ে ফেলেনি । রবীন্দ্রনাথ আপাত-সুন্দরকে দেখেছেন দৃষ্টিসীমার বাইরে, তাকে ঘোষণা করেছেন তাৎপর্যহীন বলে । অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিবলয়ে-সুন্দর, কুৎসিত পূর্ণ ও খণ্ড সব কিছুই উপস্থিত । রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকে দেখেছেন, অমিয় চক্রবর্তী তাই নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিশ্বাস গড়ে নিয়েছেন । ফলে রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্য চেতনার প্রকাশে রূপ তাঁর কবিতায় যতো মধুর, যতো মসৃণ, যত অনুভবযোগ্য, ততো বাস্তব নয় । অমিয় চক্রবর্তীর বাস্তববোধ তুলনায় অমসৃন সেখানে অনেক ফাঁক থেকে গেছে, ঠিক নিটোল পূর্ণবৃত্ত গড়ে ওঠেনি ।

বিশ্বের ঔদার্য ও সৌন্দর্যকে ব্যাহত ও বিষাক্ত করছে মানুষ— এ কথা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ অনেকেই বলেছেন । এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বাস ছিলো একটু অন্যরকম । আজকের পৃথিবীতে মানুষের অন্যায় তিনিও দেখেছেন, কিন্তু মানুষের প্রচেষ্টায় শ্রেয়োধর্মের প্রাবল্যই তাঁর বেশী চোখে পড়েছে । একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— ''মানুষের সমাজে যখন নানা উগ্র মতাবলম্বী দর্শনের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই শিল্পদৃষ্টির প্রশস্ত কাল । রাষ্ট্রিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের খণ্ডিত ব্যাখ্যায় যখন জীবনের সমগ্র ছবি চোখের ভিড়ে হারিয়ে যায়, সেই ছিন্নদর্শীর ভিড়ে এসে দাঁড়ান কবি, যিনি চক্ষুষ্মান । সম্পূর্ণতার বোধ ফিরিয়ে আনেন তিনি ।··· (১০) অমিয় চক্রবর্তীর দার্শনিক চেতনায় এই সামঞ্জস্যবোধই বিদ্যমান-যার হোতা ও কারন মানুষ— যে মানুষকে তিনি বলেছেন শিল্পী । যে লিখে, এঁকে, মূর্তি গড়ে সম্পূর্ণতার বোধ ফিরিয়ে আনে সে কারুশিল্পী; আর ''শিল্পী না হয়েও কর্মীরা বিদ্বেষহীন আত্মপরাবোধাতীত শুশ্রূষা কি করেন না ? যাঁরা করেন তাঁদের বলবো জীবনশিল্পী'' ।···(১১) 'সাম্প্রতিক' এর 'কাব্যদর্শ' প্রবন্ধে তিনি শ্রেয়োবোধকে বলেছেন কবিকৃতির আদর্শ । সেইজন্যেই মানুষের সুখদু:খের সংসারে, লোকালয়ের আপাততচ্ছ পরিবেশের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মতোই পূর্ণতার সন্ধানী কবি অমিয় চক্রবর্তী, ধূলির শ্রীভূমির সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন ।

উপনিষদের এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে মৃত্যুভাবনার প্রসঙ্গে । মৃত্যুকে পরিসমাপ্তি বলে মেনে না নিয়ে এক মহত্তর উপলব্ধি ও গভীরতর অস্তিত্ব বলে স্বীকার করেছেন তিনি, মেনে নিয়েছেন— আত্মা অবিনশ্বর । আবার প্রিয়জনের মৃত্যু স্মরণে তাঁর কবিতাও একটি অনুচ্চ, করুণ, গভীর বেদনার স্মৃতি-সৌরভ বহন করে রবীন্দ্রনাথের মতোই ।

অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুচিন্তার মধ্যে একটি ক্রমোত্তরণ লক্ষণীয় । প্রথমে তিনি মৃত্যুকে চেতনার একটি নিশ্চল স্তর বলে স্থির করেছিলেন । 'খসড়া' কাব্যের পরিধি কবিতাটি মৃত্যুচেতনামূলক প্রথম তাৎপর্যময় কবিতা— শান্ত ও বেদনায় একটি শেষের ছবি— যা অনুচ্ছ্বসিত কিন্তু আবেগহীন নয়— ''মৃত্যু একেলা ব'সে আছি,/ সব নিয়ে কাছাকাছি-/ গলির পাথরে জুতোর শব্দ,/ বাহিরে জটিল নিস্তব্ধ,/ রাত্রি আড়াল করল না ।/ মোমবাতি শিখা জ্বলে ঘরে ।''··· (১২)

— কবিতাটিতে সমাপ্তি, নিস্তব্ধতা ও বেদনার উপলব্ধি আছে কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী স্বরে কোনো মহৎ উত্তরণের ইঙ্গিত নেই । এই-ই কবির প্রাথমিক উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো আধুনিক কবি ঠিক এভাবে মৃত্যুকে দেখেন নি ।

ঈশ্বরের পূর্ণ পরিব্যপ্ত যে ঔপনিষদিক রূপর্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায়, যে বিশ্বনিয়ামকের মহাশৃঙ্খলায় সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য বিধৃত হতে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ — উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই কাছ থেকে জানলেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ঈশ্বরের এই রূপের বন্দনা তেমন দেখা যায় না । ঈশ্বরের বিশ্বশ্রষ্ঠা-রূপ কোনো কোনো কবিতায় তিনি এঁকেছেন, যেমন— 'মাটির দেয়াল' কবিতায়— সেখানেও বিশ্ববৈচিত্র্যের বিস্ময়বোধ এই কবিতার মূল সুর । স্রষ্টার মহিমা নয় ।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির দিকটি অসাধারণ-উন্নতি করার ফলে-তার শক্তি সম্পর্কে সব মানুষই সচেতন । যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের শক্তিকে এতো ধ্বংসের কাজে লাগানো হয়েছে যে, বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ-মানুষের একটা অনীহা গড়ে উঠেছিলো । সাধারণ-ভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনের সাছন্দকে বিজ্ঞান যে একটু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই । সে কারণেই সম্ভবত বিজ্ঞানের প্রতি খুব বেশী আকৃষ্ট হননি কবিরা । আধুনিক পৃথিবীর জটিল সভ্যতার চাপ-যাঁদের ক্লান্ত ও কিছুটা নাস্তিবাদী করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ । বুদ্ধদেব বসু জীবনের মৌল আবেগগুলিকে কবিতার বিষয় বলে মেনে নিয়েছেন— বিজ্ঞান বা দর্শন— কোনোটাই তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করেনি । বিষ্ণুদে বা চল্লিশের কবিরা ভেবেছেন সমাজতত্ত্ব নিয়ে; বিজ্ঞানতত্ত্ব তাঁদের মনে কোনো বিশিষ্ট প্রশ্ন জাগায় নি । অমিয় চক্রবর্তীর মনোগঠনে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উন্নতির নিদর্শনকাল একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো ।

কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর মানসিক গঠনে দার্শনিক প্রবণতা সমকালীন আধুনিক কবিদের চেয়ে স্পষ্টতর । তাঁর কবিতায় একটা দার্শনিকসুলভ নিরাশক্তি আছে । জীবনানন্দের মতো যন্ত্রনার গভীর ও জটিল চিহ্ন তাঁর কবিতায় নেই, নেই বুদ্ধদেবের মতো সৌদর্যমুগ্ধ আবেগকম্পিত কাব্যোৎসার । সুধীন্দ্রীয় হতাশাবোধ বা তার্কিকসুলভ রীতিও তাঁর কবিতায় দেখা যায় না । পৃথিবী, ঈশ্বর, মানুষের গহন গভীর চেতনার স্বরূপ, মৃত্যু ও বিজ্ঞান — এই পাঁচটি মূল ধারায় তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির স্রোত কবিতা হয়ে প্রবাহিত হয়েছে । কোনে ক্ষেত্রেই ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে পড়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না; সবত্র একটি যুক্তিজাগ্রত,পরিশ্রুত চিন্তাস্রোত তাঁকে চালনা করেছে মনে হয় । দার্শনিক যেমন একটা সিদ্ধান্তে আসেন, অমিয় চক্রবর্ত্তীও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার একটা মানসিকতা তাঁর কবিতা রচনা পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করেছেন । যদিও স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে, কবির ক্ষেত্রে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতেও পারে না এবং এসবের সঙ্গেই অকৃত্রিম আবেগসহ নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতিমালা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, পাঠকচিত্তে ঘটেছে তার অব্যর্থসঞ্চার । এই কারণে অমিয় চক্রবর্তীকে নি:সন্দেহে একজন দার্শনিক কবি বলা যায় ।

আধুনিক কবিরা সকলেই তৎকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন এবং তিরিশের দশকে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই আন্তর্জাতিক চেতনাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন । তখন আর পল্লীপ্রকৃতি, দেশভক্তি, ঈশ্বর অথবা প্রেম কিংবা বাৎসল্য নিয়ে সমগ্র কাব্য জগৎ গড়ে তোলা কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি । প্রত্যেকেরই মনের ঘরে তখন চলে গেছে আন্তর্জাতিক বোধের কোনো না কোনো বৈদ্যুতিক তার । সেইসময় অমিয় চক্রবর্তী জীবনানন্দকে দেখলেন খণ্ডিত পৃথিবীর বিষন্ন চেতনাকে বহন করতে । তিনি দেখলেন জীবনানন্দের নিজস্বতার সুস্পষ্ট চিহ্নের সঙ্গে তাঁর কবিতায় ইউরোপীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য, বাংলার লৌকিক ঐতিহ্য এবং ক্রমশ সাম্যবাদী চেতনার একটি ধারাও মিশে গিয়েছিলো । জীবনানন্দের কবিতায় আগাগোড়াই মানব-সভ্যতার বিবর্তনের একটা বাতাবরণ আছে ।

অমিয় চক্রবর্তী একটা লক্ষ্য করেছিলেন বিশ্বের রাজনৈতিক আসরের একটা বিশেষ দিক ধরা পড়েছে বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়— প্রমুখের কবিতায় । তিনি দেখেছিলেন বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিশ্ব-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর আন্তর্জাতিক আবহ তৈরী করেছে । তাঁর কবিতায় বিশ্বমানবের রাজনৈতিক ও মানসিক সংকটজাত হতাশার ধারাও দুর্লক্ষ্য নয় । সেইসময় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আরো স্পষ্ট আকারে রূপ নিলো যুদ্ধোত্তর মানুষের শূন্যতাবোধ ও গ্লানি । 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে বিশ্বকূটনীতির সামগ্রিক নির্মমতা কাব্যায়িত হল, আর ঠিক একইসময় অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় পরিস্ফুট হোলো একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত — যার এক অর্ধ বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মননের ক্ষয়, জীর্ণতা ও জটিলতায় ভঙ্গুর; অপরার্ধ শান্তি ও সেবার বিস্ময় ও মিলনের বোধে সঞ্জীব ।

আন্তর্জাতিক কবি বলা হয় বিষ্ণু দেকেও কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী যে অর্থে আন্তর্জাতিক, তিনি সে অর্থে নন । অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে বিষ্ণু দের কবিতায় আন্তর্জাতিক বিস্তার এনেছে সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ, দ্বিতীয়ত স্বদেশ ও বিদেশের সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সম্পর্কে গভীর উচ্ছ্বাস ও অকৃত্রিম অনুরাগ থাকায় সে বৈদগ্ধের পথ ধরে বিশ্বে প্রসারিত হয়ে যায় তাঁর কবিতা । কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় মানুষের ঐক্যমন্ত্রের ধ্বনি ছিলো প্রধান স্বরতরঙ্গ । তাঁর কবি-জীবনের কোনো পর্বেই এই উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটেনি ।

তাঁর মনে হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায় মানবসভ্যতার যে ক্লিষ্ট, জটিল, আত্মাধিক্কৃত চেহারা— তা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক; কিন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে জীবনানন্দ আন্তর্জাতিক মিলনচেতনা থেকে দূরে ছিলেন আর আন্তর্জাতিকতা কথাটার মধ্যে সমকালীন ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যে-সচেতন অস্তিত্বের অনুভূতি কাঙ্খিত— জীবনানন্দের কবিতায় তার উল্লেখ সর্বদা প্রত্যক্ষ নয় । তবু কবি অমিয় চক্রবর্তীর মনে হয়েছে যে জীবনানন্দের বেদনাবোধের সঙ্গে বিশ্বমানবের বেদনাবোধের নিগূঢ় ঐক্য এবং বিশ্বসাহিত্য ও বিলুপ্ত পুরাণ ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তাঁর কবিতার সূক্ষ্ম একাত্মতা — যা খালি চোখে স্পষ্ট দেখা সহজ নয় তা তাঁর কবিতাকে অন্তচারিতায় গভীরভাবে আন্তর্জাতিক করে তুলেছে ।

তাঁর চোখে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংকটবোধকে মননশীল বুদ্ধিজীবীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষনে ধরে দিয়েছেন কিন্তু আন্তর্জাতিকতার পথ ধরে কোনো আশাবাদে তিনি উপনীত হন নি । আন্তর্জাতিকতার না-ধর্মী দিকটি তাঁর কবিতায় গভীরভাবে বিশ্লেষিত কিন্তু মানুষের দুঃখের সঙ্গে নিজের হৃদয়বেদনাকে তিনি যুক্ত করেন নি । কবি শ্রী চক্রবর্তীর মনে হয়েছে— সুধীন্দ্রনাথের প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যের একটি জীবন্ত, ঐশ্বর্যবান, প্যাশনেট, ইউরোপীয়-ভাব আছে, যা লোভ, ঈর্ষা, দেহচেতনা এবং শুদ্ধতায় উত্তরিত আবেগসহ বৈচিত্র্যময় । সোনালী চুল, নীল চোখ আর পাকা দ্রাক্ষার রং নিয়ে তা বড়ো বেশী বাস্তবও । তাঁর মতে বাংলা সাহিত্যে অনন্য এই প্রেমকবিতাগুচ্ছ কিন্তু ব্যক্তিচেতনার বৃত্তেই রয়ে গেছে । যেহেতু প্রেম ঠিক নৈর্ব্যক্তিক হয় না, সেহেতু এই কবিতাগুলোকে তিনি ঠিক আন্তর্জাতিক বলতে পারেন নি ।

রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর আন্তর্জাতিক চেতনার সদৃশতার প্রশ্নটি কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না । দুজনেই গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছেন বিশ্বজোড়া মারণযজ্ঞের নিষ্ঠুরতায় এবং দুজনেই স্ব-প্রত্যয়সিদ্ধ কল্যাণ বিশ্বাসের জোরে তাকে কাটিয়ে ওঠার রাস্তায় পা রেখেছেন । তবু এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে । রবীন্দ্রনাথ পরমব্রহ্মের কারুণিক সত্তার স্পর্শ আবাল্য মনের গভীর প্রদেশে লাভ করেছিলেন । তাঁর ঈশ্বরকে শুভেচ্ছাময় সামঞ্জস্যের দেবতা রূপেই পেয়েছিলেন তিনি; পরম বিশ্বাসে সমস্ত দুঃখের আঘাতকে তিনি তাঁর পরীক্ষা বলে অবিচল ভাবে গ্রহণ করেছিলেন সারাজীবন । এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পাবার চেষ্টা করেছিলেন । অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের পৃথিবী একটু একটু করে যে ভাঙছে— এই যন্ত্রণার বোধ থেকে মুক্তি পাননি — আবার পুরোপুরি আস্থাও হারননি ।

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটি রচিত হয়েছিলো অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবিতাটি লিখে তেমন উৎসাহ বোধ করতে পারেন নি । লিখেছেন— "আমার নিজ দেশী ভাষায় যে রস আছে সেখানে পরদেশীয় রচনা পৌঁছবে না ।··· বাংলা ভাষায় কুলুপমারা এই কবিতা নিয়ে ওদের কী কাজে লাগবে ? (১৩) অমিয়চন্দ্র নিজের বিশ্লেষনী ক্ষমতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বর বা করুণাময় ব্রহ্মা তাঁর চেতনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিলো না । তিনি খোলা মনে — প্রীতিময় গ্রহণশীলতায় মানুষকে দেখেছেন এবং দেখে মনের মধ্যে জোর পেয়েছেন । মানুষ তাঁকে নিরাশ করেনি এতো বিপর্যয়ের মধ্যেও । তিনি নিজেও গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ঈশ্বরচেতনার সংহতি থেকে মানুষের মধ্যে নেমে এসেছে কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের পৃথিবীতে শুধুই মানুষ — মানুষ আর মানুষ অবশ্য কখনো কখনো তা নভোচারী হয়ে ঈশ্বরকে স্পর্শ করে ।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্নেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী । অনেকেই মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী একই মনোভূমিতে বপন করেছেন সৃষ্টিকর ফসল । এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — "তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের অধিবাসী, যে জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়" ।··· (১৪)

একথা সত্যিই যে তাঁদের দুজনের লেখায় মিল অনেক । এঁরা দুজনেই চারিদিকের পৃথিবী থেকে শুভ আর সুন্দরকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । দু'জনেরই ছিলো আশা-বিশ্বাস ও কল্যাণবোধের একটা পরিমণ্ডল । মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও প্রসন্নতায় লীন ছিলো উভয়েরই চিত্তবৃত্তি । দুঃখিত, ক্রুদ্ধ বা আহত হলেও তাঁরা উত্তেজিত হননি— ভেঙ্গেচুরে ফেলার কথা কখনো মনে আসেনি তাঁদের । প্রেমের অনুভূতিতে শারীরিকতা তাঁদের কবিতায় প্রধাণ নয়, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত । দুজনেই উপনিষদকে মনের একটি উপাদান করে নিয়েছেন । বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্র, বিশাল, সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব যেখানে এতো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেখানে মনোজগতে ও রচনাকর্মে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলা প্রবল মানসিক শক্তির পরিচায়ক ।

এই প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করে নেবার পর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা যতোই পড়া যায় ততোই তাঁর কবিতার অভিনব দিকগুলো আমাদের গভীর ভাবে আকর্ষণ করে । বস্তুত, অমিয় চক্রবর্তী যেমন অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো নন, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতোও নন । কোনো কোনো বিষয়ে তিনি ভীষণভাবে আলাদা আবার রবীন্দ্রবিরোধীও ।

কবি শ্রী অমিয় চক্রবর্তীর চোখে রবীন্দ্র-কবিতার পৃথিবীতে একটি আশ্চর্য স্থিতিবোধ আছে যা তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও অনির্বাণ থেকেছে । শেষের দিকের জীবনের অনেক বঞ্চনা যখন তাঁর জানা হয়ে গেছে তখনও তিনি শুভ-তান্ত্রিক বিশ্ব বিধানে আস্থা রেখেছেন । এক শান্ত স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব বোধের চিহ্ন বহন করে তাঁর কবিতায় বার বার একটি ঘরের কল্পনা ফিরে আসে — একটি মধুর গৃহকোণের ছবি, যেখানে মানুষ পাবে তৃপ্ত বিশ্রাম আর স্নিগ্ধ ভালোবাসা । এদিকে অমিয় চক্রবর্তীর নিজের কবিতা বিশ্লেষণ করতে গেলে যা পাওয়া যায় তা হোলো সেখানে ঘরের সত্যতার চেয়ে যাত্রার সত্যতাই প্রবল । 'কোথায় চলেছো পৃথিবী' (অভিজ্ঞান বসন্ত) কবিতাটিতে এই মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে । কবিতাটি তিনি শুরু করেছেন— "তোমারও নেই ঘর/ আছে ঘরের দিকে যাওয়া" এবং শেষ করেছেন — "আমারও নেই ঘর/ আছে ঘরের দিকে যাওয়া" । তাঁর অসংখ্য কবিতায় গতির দর্শন হয়ে উঠেছে শিল্প । গতিধর্মের এই ঐকান্তিকতা ছিলো না রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ।

অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন যে স্থাণুত্ব বা জড়ত্বকে কখনো স্বীকার করেনি রবীন্দ্র-মানস । তিনি সব সময়ই মনকে উদার, মনকে স্বচ্ছ, বুদ্ধিকে সচল ও হৃদয়কে সংস্কারমুক্ত রাখতে চেয়েছেন । বার বার বিদেশী অধ্যাপক নিয়ে এসে বিশ্বভারতীতে

একটা খোলা মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা তার প্রমাণ । কিন্তু কাজের শেষে বিশ্রামের জন্যে তিনি একান্ত নিজস্ব একটা আশ্রয়ের কথা ভেবেছেন । পথিকবৃত্তি তাঁর কোনোদিন ছিলো না । বিদেশের পটভূমি তিনি যা লিখেছেন সবই চিন্তামূলক । বিদেশ থেকে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে প্রধাণ হয়েছে বিবৃতি ও বিশ্লেষন । এতো দেশ ঘুরেও ভ্রমনের আনন্দে তিনি কোনো ভ্রমণ-কাহিনী লেখেননি । হয়তো ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁব একটা ক্লান্তিকর বোধ পরিণত বয়সে দেখা দিয়েছিলো— "পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে যে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই । ভ্রমণ-জিনিসটা উদ্‌বৃত্তির মতো, একটু একটু করে কুড়িয়ে চলা" ।··· (১৫)

অমিয় চক্রবর্তীর মনের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি ঘর চেয়েছেন ক্ষনিক বিশ্রামের জন্যে আর সারা জীবনের জন্যে চেয়েছেন অন্তহীন চলা — নিত্যযাত্রী পৃথিবীর মতো, বিরামহীন সময়ের মতো । তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মে গভীর ভাবে মিশে আছে পথযাত্রার আনন্দ ।

অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বলাকা-পাঠে যে গতিধর্মের কথা বলেছেন তার সঙ্গে তাঁর উপলব্ধির পার্থক্য আছে । তাঁর মতে বলাকায় প্রধাণ হয়েছে দার্শনিক বোধ, সহজ প্রসন্নতা নয় । সেখানে গতিচেতনা তীব্র আবেগ দ্বারা তাড়িত এবং সেই মুক্তি ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ধীরে ধীরে সুস্থ স্থিতিবোধে উত্তীর্ণ । জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার বাঁকে বাঁকে ঘা খেয়ে শুভ্র প্রতিম চেতনালোকে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে নিষ্কম্প কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন — "কঠিনেরে ভালোবাসিলা/ সে কখনো করে না বঞ্চনা" ।···(১৬) এই বিন্দুতে অমিয় চক্রবর্তীর কখনো উত্তরণ ঘটেনি । নিরাশ্রয় চলাকে জীবনের সহজ ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী এবং খুব বেশী বিচলিত হন নি । এরমধ্যেই মানুষকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে তাঁর প্রত্যয় এবং জীবনের সার্থকতার উপলব্ধি । যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গৃহহীন তাই যেন মানুষের স্বাভাবিক পরিচয় — তাঁর কবিতায় এমন একটা মনোভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় ।

"অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন যে শুভবাদী মূল্যবোধ গভীর ছিলো রবীন্দ্রচিত্তে তা মূলত উনিশ শতকীয় । তারপর এই শতকের যুদ্ধ, ধ্বংস ও আগ্রাসী নির্মমতা তাঁকে একটি কঠিন আত্মাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলো । তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠি ও প্রবন্ধে এই সত্তা-সংকটের তীব্রতা ধরা পড়েছে ।"···(১৭)

মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে সভ্যতা মানুষখাদক ।··· আর যে সভ্যতা প্রাচুর্য অভিমানী তারও দাবী তো মেটাতে হবে । কী দিয়ে ? যে দুর্বল তারই ক্ষুধার অন্ন দিয়ে" ।···(১৮)

এক স্থিতিপ্রসন্ন মনের অধিকারী হওয়াতে জীবনের রূঢ় কুৎসিত দিকটির প্রকাশ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়— কখনোই অতি প্রকট নয় । কল্লোলীয় লেখকগোষ্ঠীর মতো ইচ্ছাকৃত অনাবৃতিকরনের প্রয়াস তো একেবারেই নেই কিন্তু তাঁর মতাদর্শ এ বিষয়ে রবীন্দ্র অনুগামী ছিলোনা সে কথা তিনি অস্পষ্ট রাখেননি ।

অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য তাঁকে সরাসরি রবীন্দ্রবৃত্তে স্থাপন করতে চায় । — তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন "সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী ।··· আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে আধ্যাত্মিক কথাটা প্রয়োগ করতে চাই । অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম" ।··· (১৯)

আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর বিজ্ঞানচেতনা সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল । বিজ্ঞান-ভাবনায় আর কোনো আধুনিক কবি এমন ভাবে প্রভাবিত হননি, বিজ্ঞানের পরিভাষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে আর কোনো আধুনিক কবি এমন প্রবণতা দেখান নি । কবি শ্রী অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন যে — রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব থাকলেও বিজ্ঞান

তাঁর কাব্যে বড়ো স্থান অধিকার করেনি । তিনি দেখেছিলেন 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে যন্ত্রের প্রাণহীন অনুশাসনের রূপটির প্রতি তিনি বার বার ইঙ্গিত করেছেন, 'নবজাতক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে যন্ত্রকে দানবের সঙ্গে তুলনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তবে অমিয় চক্রবর্তী এও দেখেছিলেন যে বিজ্ঞানচেতনা বুদ্ধদেবের কাব্যেরও প্রধাণ লক্ষণ নয় বরং বিজ্ঞান যে দুঃশাসনের মতো পৃথিবার রহস্য একটি একটি করে উন্মোচিত করছে — সেজন্যে তিনি মর্মাহত । অমিয় চক্রবর্তী এই দ্বৈধ মনোভাব জীবনানন্দের মধ্যে দেখেছিলেন আর দেখেছিলেন যন্ত্রের মারণ-শক্তি দর্শনে হতাশ্বাস সুধীন্দ্রনাথকে । তাঁর দৃষ্টিতে বিষ্ণু দের কাব্যে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি থাকলেও যন্ত্রের চিত্রকল্প তিনি বিশেষ ব্যবহার করেননি তার বদলে চিত্র ও সংগীতের পরিভাষাকে অধিক ব্যবহার করেছেন তিনি ।

"যন্ত্র যে — আমাদের বাইরের তথা অন্তরের দৃষ্টিকেও পরিবর্তিত করে দিচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতনতা দেখালেন প্রথম অমিয় চক্রবর্তী । অথচ যন্ত্রই যে জীবনের একমাত্র তুলাদণ্ড নয় এবং তার রহস্যই জীবনের চরম রহস্য নয় — এ সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা ছিলো ।" ··· (২০)

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যেকোনো মানসিক বিপর্যয়, বিক্ষোভ, ঝড় বেদনা সবই আত্মা অতিক্রম করতে পারে তাই উপনিষদের স্থির আত্মার প্রতীক রূপী বৃক্ষের বন্দনা তাঁর কাব্যে এতো ব্যবহৃত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বিরহের মধের পূর্ণতার প্রসাদ পেয়েছিলেন । প্রিয়ার স্থিতি তাঁর অন্তরে রেখে গিয়েছিলো পরশমনি । মনে হয়েছিলো "তবু শূণ্য শূণ্য নয়" । অমিয় চক্রবর্তী নিজে সে সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত ।যতোই তিনি প্রেমের বদলে কী কী পেলেন তার তালিকা প্রস্তুত করুন না কেন, না পাওয়ার বেদনা থেকে থেকে অশান্ত হয়ে উঠেছে ।

এই প্রেম-বিরহমূলক কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে কবি বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দের কবিতার মধ্যেই সার্থক মিলনাত্তিক প্রেমের রূপকে খুঁজে পাওয়া যায় । তিনি দেখেছিলেন যে বুদ্ধদেব বসু পূর্বরাগ ও সম্ভোগের পরবর্তী অধ্যায় লেখেননি আর বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতার পটভূমিকা এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা । তাঁর প্রিয়া কমরেড । আসলে এই সমস্ত কবিদের কবিতার একটা সাময়িক মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ— এঁরা সকলেই মূলত বিরহের কবি । জীবনানন্দের প্রিয়া মৃতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রিয়া ক্ষনিকা আর অমিয় চক্রবর্তীর প্রিয়া দূরগামিনী ।

ত্রিশ দশকে রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা লিখলেন তাতেও লক্ষ্য করা গেলো অন্য ধরনের এক প্রখরতর বিশ্ব-পরিস্থিতির চেতনা, যা তার আগের পাঠের কবিতার হৃদয়ানুভব প্রধান মানবতাবোধের চেয়ে একটু আলাদা । যে নতুন কবিগোষ্ঠী উঠে এলেন ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, তাঁদের চিন্তায় প্রথম থেকেই একান্ত দেশচেতনার সঙ্গে মিশে গেলো এক সামাজিক চেতনা অর্থ্যাৎ বিশ্বচেতনা । মহাপৃথিবী পর্বের কবিতা থেকেই মানুষ ও মানবসভ্যতাকে প্রগাঢ় ভাবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গ্রথিত করে নিয়ে দেখলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় গভীর ও গম্ভীর রূপ নিয়ে প্রতিফলিত হোলো বিশ্ব-পরিস্থিতির সংকট, বিষ্ণু দে-র কাব্যসৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নিয়ে এলো বিশেষ করে ইউরোপের সাহিত্য-শিল্প-সংগীত ও রাজনীতির সংস্পর্শ । প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনা বিস্তৃত হোলো নানা পথে । কখনো আঁধার বরন 'আফ্রিকার' মহত্ত্ব ঘোষণায়, কখনো নীল নদীতট' থেকে গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে' অতীত সভ্যতার সন্ধানে, কখনো 'কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে খোরশান থেকে বাদকশান' ।

তবু এমন কথা বলা চলে না যে, এই কবিরা নিজেদের মানস-অস্বিত্বের মূল বিন্দুটিকে নিয়ে গেছেন মহাবিশ্বের অঙ্গনে । বলা যায়, ভারতীয় ও বাঙালী মনের পরিপ্রেক্ষিতে ও অবস্থানের মধ্যে থেকেই বিশ্ব-আবহকে কোথাও কোথাও মিশিয়ে

নিয়েছেন তাঁদের কবিতায় । এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত, হয়তো বা কাম্যও । স্বদেশ অবস্থান থেকে ঠিক বিচ্যুত হওয়া সম্ভবও নয় ঠিক কিন্তু তারই মধ্যে একটু আলাদা ছিলো অমিয় চক্রবর্তীর মানসিকতা ।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী গুলি থেকে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় উদ্ভাসিত হয় তা যেন বিশেষভাবে বাঙালীর ঠিক নয় । তা এমন একজন মানুষের যিনি বিশ্বের প্রতিটি দেশকে ভাবতে পারেন আপন দেশ । পৃথিবীর সর্বত্র প্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁকে সুখ দেয়, পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যভাস, পরিচ্ছদ, জীবনযাপন ও ভাষার নানামুখিতায় তিনি প্রীতিলাভ করেন । পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম তাঁকে অভিভূত করে । যে-কোনো দেশের সাধারণ মানুষ তাঁর আত্মীয় । রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে মানববিরোধী— সে যে দেশই হোক, তিনি তার প্রতিবাদী । এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেন কিনা সে চিন্তা তাঁর কোনোদিনই ছিলো না, এমন পৃথিবী যে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না — এই পূর্ণতা বোধেই তিনি তৃপ্ত ।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যপ্রকরণ বিশেষভাবে আধুনিক এবং তা রাবীন্দ্রিক নয় । রবীন্দ্রনাথের ভাষা স্বচ্ছন্দ-ও মসৃণ, বক্তব্য ও অনুভূতিকে স্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ইচ্ছুক এবং পাঠক চিত্তে সরাসরি প্রবেশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য । অমিয় চক্রবর্তীর প্রকাশরীতি আধুনিক যুগের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত ও জটিলতর । এ যুগের বিজ্ঞানের আবিষ্কারক, মনোবিজ্ঞানের নবতম সিদ্ধান্ত, মনের অবচেতন ও প্রাক্ চেতন স্তরের স্বীকৃতি — কবিতার রূপকর্মে সেই স্বীকৃতির প্রভাব; ইমপ্রেশ নিজমের আঙ্গিক, প্রতীক, লক্ষণ এ সবই অন্যান্য আধুনিক কবিতার মতো তাঁর কবিতাতেও লভ্য । ফলে বিশেষ শিক্ষা, রুচি ও সাহিত্যবোধ-সম্পন্ন পাঠকের কাছেই তা আদরনীয় । রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন গভীর ভাবে না বুঝলেও সমস্ত পাঠকের কোনো না কোনো কারণে ভালো লেগে যায়-তেমন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় হয় না । প্রয়াসসাধ্য পাঠাভ্যাস গড়ে তুলে তবেই পড়তে হয় তাঁর কবিতা । নিজের ধরনে শব্দপ্রয়োগ ও কাব্যগঠন করেন তিনি — অধিকাংশ পাঠকের মুখ চেয়ে নয় । সম্পূর্ণ নতুন ছন্দোরীতির আপাত-অমসৃনতা তাঁকে রবীন্দ্র-কবিতার সুললিত ছন্দের রাজ্য থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে স্থাপন করেছে । রচনা রীতিতে রুদ্বেগ গদ্য ভঙ্গি — যাকে কেউ কেউ রিপোর্টিং বলেছেন — তা অমিয় চক্রবর্তীর বিশিষ্টতা, রবীন্দ্রনাথে তা নেই ।

এইসব গূঢ় অমিল সত্ত্বেও অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাদ-ও স্মৃতি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পড়ার সময়ে পাঠকের মনে ফিরে আসে । তার কারণ প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল কবিতাসম্ভারে যে তিক্ততাহীন মানবিকতাবোধ ও জাগতিক কল্যাণধর্মে আস্থার ভাবটি পাওয়া যায় তা কবিতাপাঠকের একরকম সংস্কারেই পরিণত হয়েছিলো । আধুনিক কবিতায় এসে সেই সংস্কার নাড়া খেয়েছে তীব্রভাবে, কিন্তু কিছুটা পুরোনো ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে শুধু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেই । দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অতি সহজে যে দার্শনিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার একটি বড়ো অংশে সেই সূক্ষ্ম ভাবময় দার্শনিকতার পরিচয় পাঠক পেতে পারেন । তৃতীয়ত, দুই কবিরই এমন একটা ক্ষমতা আছে যাতে সামান্য বস্তুকেও অসাম্যতার স্পর্শে একটা অতিলৌকিক আভায়ে জড়িয়ে দিতে পারেন তাঁরা । কোনো কথা না বলেই অনেক কথা বলে যাবার শক্তি দুজনেরই আছে বলে অনেক সময়ে দুজনের কবিতা অনেকটা একরকম এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা প্রায় রবীন্দ্রনাথের গানের মতো । বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্যটিও কোনো কোনো সময়ে মেনে নিতে ইচ্ছে করে, যদিও দুই কবির চেতনালোক; চিন্তাক্ষেত্রে ও নির্মানকলায় ভিন্নতার অংশই বৃহত্তর।

সামগ্রিক ভাবে অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানস রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে পরিণতি পেয়েছে — একথা স্বীকার্য । কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর সাহচর্য রবীন্দ্র মানসে তেমন কোনো গভীর ছাপ ফেলেছিলো কি যাতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তার কোনো স্থায়ী ফল লক্ষ্য করা যায় ? 'নবজাতক' এর কবিতাবলি নির্বাচন ও গ্রন্থন করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, 'সানাই' এর কবিতা নির্বাচনেও

তাঁর হাত ছিলো — কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী, পরোক্ষে হলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় আরো কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । জীবনের শেষ তিনি চার বছর রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংকট । তাঁর বিশ্লেষণ, সংশয়, হতাশা সবই প্রায় প্রকাশ পেয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর লেখা চিঠিগুলিতে । তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাটিকে উপলব্ধি করার যোগ্য মানসিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই সেই পত্রগুলি অসাধারণ বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ নিবন্ধ হয়ে উঠেছে ; আরো একটা কথা অনুমান করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার আন্দোলন সম্পর্কে খুব উৎসাহিত ছিলেন না — যদিও স্বীকার করেছিলেন তার শক্তিকে । অমিয় চক্রবর্তী কোনো আধুনিক সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কোনো পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গেও যোগ ছিলো না তাঁর । উপরন্তু তিনি বহুকাল শান্তিনিকেতনবাসী, রবীন্দ্রনাথের একান্ত নির্ভরতার পাত্র এবং একসময়ে তাঁর নিত্যসঙ্গী । অথচ তাঁরই লেখায় আধুনিক সাহিত্য চেতনার উন্মুক্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে এ-বিষয়ে সচেতন রেখেছিল । 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধটি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কেই লেখা । অমিয় চক্রবর্তীর কবি ব্যক্তিত্বের সঙ্গ অনুপস্থিত থাকলে হয়তো আধুনিক কবিতা সম্পর্কে রবীনদ্রনাথের মন আরো একটু বিমুখ থাকতো ।

"অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার হার্দ্যগুণ । তিনি যেন-সকলের আত্মার আত্মীয় । ধুলো পায়ে জুতো না খুলেই একেবারে অন্দরমহলে এসে ঢোকেন, আপনজনের মতো সুখ-দুঃখের কথা বলেন । যেমন অতর্কিতে আসেন, তেমনই আবার বিনা আড়ম্বরে বিদায় নেন, যার কথা হয়ত সকল সময় আমাদের মনে থাকে না, কিন্তু যিনি একদিন না এলে অভাববোধের অশ্বস্তি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে । তাঁর কবিতার সূক্ষ্ম সৌরভে মিশে আছে একটি সুকুমার মেয়েলি ছোঁয়াটা । তাই সবকিছু দিয়েও নিজেকে সব সময় আড়াল করে রাখা তাঁর অভ্যাস ।"··· (২১)

অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা বাদ পড়েছে । অবশ্য এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে এর ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে । প্রত্যেক কবিই আপন কাব্যাদর্শ অনুযায়ী বাস্তবের নির্বাচন করেন, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রানুযায়ী কবি সমাজের কবিতায় বাস্তবের প্রতি অবহেলা ঘটেছে অস্বাভাবিক কারণে । তাঁরা নিজেদের চোখ দিয়ে জীবন ও জগতকে দেখতে চাননি, রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, ফলে তাঁদের কবিতা পাঠকের মনে অনায়াস প্রতীতি নিয়ে আসে না । রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁদের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো বলে তাঁদের কবিতায় স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশও আচ্ছন্ন । যুগের পরিবর্তনও তাঁদের কবিতায় ধরা পড়েনি । তাঁদের কবিতায় কবিমনের সেই অতলস্পর্শী অভিজ্ঞতা নেই, যা বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও পাঠকের মনের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে । অনেক জায়গাতেই তাঁদের কবিতায় অনুভবের ফাঁকি ধরা পড়ে । আধুনিক কবিতা সেই ফাঁকির বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ ।

অমিয় চক্রবর্তীও সেই বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে কাব্যের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন । 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র যুগে আমরা কবিমনের পরিবর্তমান বাস্তবের প্রতি আকর্ষনকে গভীর ভাবে অনুভব করি । বাস্তবের প্রতি দুর্মর আসক্তি ও তার নিপুন বর্ণনা তাঁর কবিতায় একটি স্বতন্ত্র ও সতেজ রসের আস্বাদ এনে দিয়েছে । বাস্তবের প্রতি গভীর আসক্তি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার শব্দচেতনার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে । চলতি শব্দ ব্যবহারে অমিয় চক্রবর্তী দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক । এলিয়ট একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ভাষার প্রতি দুটি কর্তব্য আছে, যাদের প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে । যখন কবিতার ভাষা বিবর্ণ ও স্বাদহীন হয়ে পড়ে তখন সাধারনের চলতি ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে কবিতায় নতুন রক্তের সঞ্চার করা কবির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, কিন্তু যখন জনসাধারণের চলতি ভাষা অবক্ষয়ের পথে তখন কবির কর্তব্য হলো ভাষার ঐতিহ্যগত গৌরব ও সমৃদ্ধি রক্ষা করা ।

অমিয় চক্রবর্তী দেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেনকে চলতি শব্দ ব্যবহার করে কবিতার ভাষায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করতে । তিনিও সেই পক্ষই অণুসরণ করেছিলেন ।

কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তবের বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য নয় । বাস্তবের টুকরো ছবিগুলি তার শিল্পকর্মের উপাদান - এদের তিনি প্রয়োজন মতো কাব্যশরীরে গেঁথে দেন যার ফলে সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড শিল্পকর্ম রচিত হয় । এর সঙ্গে মিশে থাকে কবির বাসনার বেদনা, যা একটি সুরের জন্ম দেয় । সব মিলিয়ে তাঁর কবিতার বানী পাঠকের অন্তরে অমোঘ অভিঘাত নিয়ে আসে, তাই আমাদের প্রাচীণেরা বলেছেন কবির দৃষ্টি সর্বোপরি দৃষ্টি। আমার মনে হয় সর্বোপরি বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন সম্যক, সামগ্রিক ও সুসঙ্গত অন্তদৃষ্টি। Acre of green-grass, এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে সর্বত্রচারিতা · · · বহুদর্শিতা মানুষের পারস্পরিক সভ্যতার পক্ষে একান্ত কাম্য কারণ তাতেই শিল্পীর মহৎ মুক্তি । রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে সবত্রচারিতা বহুদর্শিতা'র যে নিদর্শন আমরা অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে পেয়েছি — তার কোন তুলনা নেই ।

"রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখাই শাশ্বতকালের আধুনিকতা । এই বিশ্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়েই 'খসড়া'র কবি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ।" · · · (২৩)

'খসড়া' এবং 'এক মুঠো' অমিয় চক্রবর্তীর গোত্রান্তর । ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুরত কবি । ভাবে ও ভাষায় রাবীদ্রিক ঐতিহ্যকে অণুসরণ করেছেন । ১৯৩৩ সালে গুরুর আশ্রম থেকে ইস্তফা দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী অক্সফোর্ডে পড়তে যান । সেখানে গিয়ে তিনি তৎকালীন ইংরেজি শিল্পশালায় প্রবেশ করেন । পাশ্চাত্যের ভাবধারায় — বিষয়ে ও প্রকাশে তাঁর কবিমানসের গোত্রান্তর হয় সেই সময়ই । অক্সফোর্ডে পাঁচ বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে আসার পর তার 'খসড়া' (১৯৩৮) এবং 'এক মুঠো' (১৯৩৯) প্রকাশিত হয় । এই যুগল কাব্যের কবিকৃতি একেবারেই বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । এই প্রথম বাংলায় এমন কবিতা লেখা হলো যা তৎকালীন ইংরেজি কাব্যের সমগোত্রীয় । তখন ইংরেজি সাহিত্যে তিনটি প্রভাব সুস্পষ্ট - ফ্রয়েড ও মার্কসের চিন্তাধারা এবং বিশশতকীয় বিজ্ঞান মনস্কতা । অমিয় চক্রবর্তী মার্কসকে গ্রহণ করেননি, কিন্তু ফ্রয়েডকে আত্মসাৎ করেছেন, আর করেছেন বিজ্ঞান চেতনাকে । লরেন্স ডারেল তাঁর 'কী টু মর্ডান পোয়েট্রি' গ্রন্থে ফ্রয়েড সম্পর্কে লিখেছেন — "His ideas have allowed us access to a new territory inside ourselves in which each one of us who is suking to grow, to identify himself more fully with life, will feell like columbrus discovering America." (24)

মানুষের অন্তর্লোকে চেতন-অবচেতন মিলিয়ে এই যে আবিষ্কার, এর ফলে মানুষের চিন্তাও চেতনা অতলস্পর্শ গভীরতায় প্রবেশ করলো । মনের এই সমগ্রতাকে প্রকাশ করার জন্যে নতুন বাগ্ ভঙ্গির প্রয়োজন হলো । তা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন দুর্বোধ্য । এই নতুন কবিভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে এই কবিতাগুলি পড়লে ছায়াপথের সঙ্গে তুলনা মনে আসে, এখানে স্পষ্ট ও অস্পষ্টের খেলা রয়ে গেছে । মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে এখানে নবযুগের কাব্যকে ভুল বুঝেছেন । তাই নবযুগের এই আলো-আঁধারি বাগভঙ্গিকে নির্দ্বিধায় নিরর্থক বলতে পেরেছেন । তবে একথা বললে কিন্তু আধুনিক কবিতার প্রতি সুবিচার করা হয় না । এতদিন মানুষ চেতনালোকের ভাষা নিয়েই কারবার করেছে, অবচেতন লোকের ভাষা মন: সমীক্ষকেরই ব্যাখ্যার এলাকাভুক্ত ছিলো । নবযুগের কবি ইঙ্গিতময় ভাষাকে কাব্যের এলাকাভুক্ত করেছেন । এই প্রসঙ্গে 'খসড়া'র 'নামা-ওঠা' কবিতাটি মনে পড়ে । সেখানে তিনি লিখেছেন 'গিয়েছি শিকড় বেয়ে নামি । / মাটির নীরবে এসে থামি / ভূমিকায় । / তখন মধ্যাহ্নবেলা, তবু মোর জ্ঞানে / দিন রাত্রি চোখ বোঁজা / এক দৃষ্টি ।"

অন্যান্য আধুনিক কবির মতো অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক । আর সকলের মতো তিনিও প্রয়োজনমতো,

সাধ্যমতো রবীন্দ্রনাথ থেকে যা নিতে পেরেছেন, নিয়েছেন । যা নিয়েছেন তা ব্যবহার করে আসলের যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন তা-তে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও চিত্ত সমৃদ্ধির পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে ।

শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবিদের পুরোধা হিসেবে মেনে নিলে প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে অনাধুনিক বলে চিহ্নিত করতে হয়, যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের মধ্যে যে ধারাবাহিকতা বর্তমান, তা উপেক্ষা করা যায় না । অসলে বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগের আরম্ভ মাইকেল থেকে । আজ পর্যন্ত তার তিনটি অধ্যায় সহজেই চোখে পড়ে; মাইকেলের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগ, আধুনিক কবিদের যুগ । মাইকেলের যুগের সঙ্গে যেমন রবীন্দ্রনাথের যুগের চিহ্নিত ব্যবধান বর্তমান, তেমনি রবীন্দ্র-যুগের সঙ্গে আধুনিক কবিদের যুগের ব্যবধানও দুস্তর । সুতরাং ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি হলেও বিশেষ অর্থে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে ইত্যাদি যে অর্থে আধুনিক কবি, তিনি সে অর্থে নন । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মানসিকতাতেও পরিবর্তন এসেছে আর মনোভঙ্গির পরিবর্তন রচনারীতিতেও এনেছে স্বাতন্ত্র্য । সেই পরিবর্তিত মনোভঙ্গি ও স্বাতন্ত্র্য রচনাভঙ্গির পরিচয় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতে পাওয়া যায় বলেই তিনি বিশ শতকের আধুনিক কবি । অন্যান্য আধুনিক কবির মতোই বর্তমান যুগের আত্মার প্রতিফলন তাঁর কবিতায় ঘটেছে । কাজেই অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতর উত্তরাধিকারী এ দুজনের জগৎ মূলত এক অথবা রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যায়ে-আধুনিক কবি ইত্যাদি উক্তি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে অযথার্থ ও বিভ্রান্তিকর ।

"অমিয় চক্রবর্তীর কোনো কোনো চিত্রকল্পের সঙ্গে রিলর্কের চিত্রকল্পের মিল দেখা যায় । ১৯১১-২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রিলকের কাব্যাদর্শে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো । বহির্জগতের বহুল বৈচিত্র্যের পশ্চাতে না ঘুরে তিনি অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বুঝলেন যে তাকে বাদ দিয়ে কোনো ঘটনার কোনো মূল্য নেই ।" ···(২৫)

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অজস্র চিত্রকল্প নজরে পড়ে । এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি — (ক) 'তোমার মন্দিরে প্রভু, সারা সূর্যবেলা / সিঁড়িতে ধুয়েছি ধাপ, / নীচের আঙন / নিকিয়েছি, কুয়ো থেকে জল / বাঁকে বয়ে দেবোদ্যানে দিয়েছি বিকেলে ।" ··· (২৬) (খ) " ত্রিশূল স্থির । / সুরের শাদা চূড়ো । / ভোরের দীর্ঘ স্বর্ণাভ নারকেলগাছ প্রাথমিক ।/ ঝরঝর ঠান্ডা সুর জ্বাল সৌরভী বাগানে । / দেউলে জ্বলছে শিখা মেঘনীল বেদনা / হে সুরের চৈতন্য / বিহবল কথার ধুলি উড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তে-মম ।" ···(২৭) রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব এখানে বর্ণিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ, মন্দির ও গাছ — এই তিনটি প্রতীক একত্রে মিলিত হয়েছে এখানে ।

উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেই একই মনের পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন সমুদ্রকে দেখেছেন কারখানার চিত্রকল্পে, তেমনই তারাভরা আকাশকে মনে হয়েছে হাতখড়ি, কুয়োকে মনে হয়েছে চোঙ । বলাবাহুল্য এ ,সমস্তই চমক লাগানো অভিনবত্ব । আর যে অভিনবত্ব চমক লাগায় তার প্রভাব যে ক্ষণ-স্থায়ী, মানুষের অভিজ্ঞতা সে-কথা জানে । অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যজীবনের প্রথম পর্ব অভিনব, সম্পূর্ণ অভিনব । কবিতার বিষয়বস্তু, শব্দ, উপমা ও ছন্দ বিষয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অণুশীলন শ্রদ্ধার যোগ্য হলেও বলতে হয় যে এ-ক্ষেত্রে হাততালি দুবার পড়ে, একবার বাহবা দেবার জন্যে, আর একবার দুয়ো দেবার জন্যে । অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক হতে গিয়ে যে অতিশয্য ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে 'খসড়া' ও 'একমুঠো'র' বহু রচনাই ব্যর্থ হয়েছে । তবু কবিমনের প্রবণতা উপলব্ধির জন্যে এরা অপরিহার্য । পরবর্তী জীবনে গভীরতর অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি তাঁর আবিষ্কারের ফলগুলিকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই ভালো কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে ।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর জীবনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি কী পেয়েছেন তা বিস্তৃত করে বললেও হবে অশেষ । রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি তাঁর জীবনদর্শনের পূর্ণতা পেয়েছেন । মানুষকে

দেখবার চোখ, ভালোবাসার শক্তি, দেশ-সম্পর্কে চেতনা, শুদ্ধ যুক্তি, বিশ্বমানবকে আপন করবার প্রেরণা — এসবই তাঁর মননশীলতার রবীন্দ্র-প্রভাবেরই প্রচ্ছন্ন ফল। অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন যে তাঁর অস্তিত্বের মূলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার চেতনাও তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পাওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— '১৯২১ থেকে এই শান্তিনিকেতনই আমার ঘর'।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা এসেছিলো উপনিষদ থেকে। ঈশ্বরীয় শক্তির পরিণতিই তিনি সকলের মধ্যে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বর উপলব্ধি অমিয় চক্রবর্তীকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন — "আমি মানুষের প্রতি আস্থা থেকেই আধ্যাত্মিক চিন্তায় পৌঁছেছিলাম। মানুষের চোখেই ঐশিকতাকে দেখেছি"।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মানসিকতার মিল ও অমিল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবিদ্যার আধিক্য পছন্দ করতেন না। যন্ত্রপাতির প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তাঁর রচনায়., অথচ স্বচ্ছ বিজ্ঞানচেতনার কোনো অভাব ছিলো না তাঁর। সম্ভবত আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ধ্বংসলীলায় বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। আর এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত এই ছিলো যে আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। আধুনিক জীবনকে সবদিক থেকে প্রাচুর্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বিজ্ঞান।

আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে আধুনিক সাহিত্যের ভাষার জটিলতা সমর্থন যোগ্য নয়। মানুষের মনোজগতের একটা সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত।

তাঁর কবিতায় বিদেশী কবিদের প্রভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে নানা প্রকার রচনা পাঠের সম্মিলিত প্রভাবই সৃষ্টি কর্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। কোন একজনের প্রভাব নয় বা সচেতন পথও নয়। সেভাবে সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ইয়েটস, এলিয়ট, এজারা পাউণ্ড, ফ্রস্ট-প্রভৃতি কবির প্রভাব তাঁর কাব্য সৃষ্টির মূলে সক্রিয় ভাবে কাজ করেছে। এছাড়া তাঁর রচনায় 'কল্লোল' পত্রিকার প্রভাবকেও তিনি সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিয়েছেন।

অন্যান্য আধুনিক কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কবি অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন যে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গেই তার সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ ছিলো। তাঁকে সখ্য সূত্রে বাঁধতে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। এছাড়াও সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — "অনেককেই চিনতাম। তবে প্রবাসে ছিলাম, ঘনিষ্ঠতা তেমন হয়নি"।··· (২৮)

নিজের রাজনৈতিক চেতনার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, গান্ধীজীর মানবিকতাবোধ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। গান্ধীজীর তীব্র স্পর্শকাতরতা, পীড়িত মানুষের জন্যে মমতাবোধ করবার প্রবল শক্তি — তাঁর চিন্তায় প্রবল আলোড়ন জাগায়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে এ শক্তি বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মধ্যেও ছিলো। বহু মানুষের মধ্যে চেতনা জাগাবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধির প্রতি যে একটা প্রীতি পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায় তার মূল নিহিত তাঁর মানবপ্রীতির গভীরেই। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার ফল। এর ফলে ধনী হয়েছে মানুষের সভ্যতা। দ্রুতগতি এরোপ্লেন, সমুদ্র ডিঙোনো জাহাজ, সুদূর ভাষী টেলিফোন, কঠিন রোগের প্রতিষেধক ওষুধ ও হাসপাতাল, বাসস্থান সমস্যার সমাধানে বহুতল বাড়ী — এ সবের মধ্যেই তিনি মানুষের শক্তি ও হৃদয় বৃত্তির স্বাক্ষর মুদ্রিত দেখেন। সমৃদ্ধ এক নগর সভ্যতার ছবিই তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে। কিন্তু তাই বলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশের মানুষদের তিনি ভোলেন না

। এই ভারতবর্ষেরই বাংলার প্রাণের এক-একটি ছবি তিনি জীবন্ত ভাবে আঁকতে পেরেছেন — মানুষজনকে নিজের মনে করেছেন বলেই । এরোপ্লেন, জাহাজ ডুলিয়ে দিতে পারেনি এদেশের ঠেলাগাড়ীর ছবি । সে ছবিতেও কোনো করুনা বা হতাশা নেই — একই রকম প্রীতিময় প্রসন্নতা 'বন-গাঁওয়ের বাইরে এলো বোঝাই ঠেলা-গাড়ি / ছোটো ক্ষেতের মধ্যে ভরা মাটির কলসি-হাঁড়ি / লাউ কুমড়ো কলার কাঁদি আলু বেগুন আদা / ঝাঁকায় জড়ো দড়ির জালে শাকের আঁটি বাঁধা / লোকে বলে দাম কত গা ? কচু কলাই ডাঁটা ? / রামনবমীর ঠিক দুপুরে বেচারামের হাঁটা "।···(২৯)

ঠিক এমন ভাবে — এত সহজ, বাস্তব অথচ সেই সহজ কথায় সুতোয় বোনা গভীর মানবতাবোধের নক্শা — এই সুরটি আমরা আর কোনো বাঙালী কবির লেখাতেই পাই না, যে সুর সারা পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে একই মধুর মন্দ্রে বেজে যায় কবির সারাজীবন ধরে প্রতিটি লেখাতেই।

এজন্যেই অমিয় চক্রবর্তীকে আমাদের বুঝতে হবে একটু অন্যভাবে । কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, হিমালয় থেকে সিন্ধুর অন্তবর্তী ভূমি শুধু নয়, তার দৃষ্টি সত্যিই যেন বিস্তৃত দুই মেরু প্রদেশের অন্তবর্তী সমগ্র মানব-বসতি জুড়ে । সেখানে এস্কিমো আর বাঙালী, ফরাসী জার্মান আর ইহুদি সকলেরই হৃৎস্পদনে বাজে একই ধ্বনি । সর্ব সংস্কার মুক্ত এক আধুনিক কালের মানবতাবাদী অমিয় চক্রবর্তী তাঁর জীবন ও সৃষ্টি কর্মের মধ্যে দিয়ে এই কথাই ঘোষণা করে গেলেন ।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার তিনখানি কাব্যসংকলন 'অমরাবতী' (প্রকাশ: ১৩৯৭ / ১৯৭২) 'অনিঃশেষ' (প্রকাশ: ১৩৮৩/১৯১৬) এবং 'নতুন কবিতা' (প্রকাশ: ১৩৮৭-১৯৮০) । 'অমরাবতীর' পরিচয়-এ কবি লিখেছেন শেষ ক-বছরের কবিতা থেকে এই সংগ্রহ; এর মধ্যে বিশেষ প্রসঙ্গত অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রে গাঁথা রচনা বাদ দিইনি । প্রথম কবিতার নাম 'তীর্থ-পত্র' । এই 'তীর্থ-পত্র' কবিতায় আছে বিশ্ব-জনীন-তীর্থ-পরিক্রমার স্মৃতি ও ছন্দ — 'প্লেনের ট্রেনের ঘোড়ার গাড়ির/ যাত্রা একই, সবার বাড়ির / বৃহৎ ধরায় সংসারে যাই—/ ঘোরাঘুরির ছন্দটা তাই' — সবার বাড়ির বৃহৎ ধরায় পরিক্রমাই কবির তীর্থযাত্রা । কিন্তু শেষ পরিক্রমা স্বদেশের মাটি ও মনে, তীর্থ শেষে ভাবি দেশেও / ভ্রমণ বিলাস চরম সেও / ইতিহাসের মর্মে মেশে; / পথের সঙ্গে স্মৃতির বেশে । দ্বিতীয় কবিতায় কবি-নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, স্বদেশ অনতিক্রম্য । সেখানে তিনি বলেছেন — 'দশটা সাগর বারোটা দেশ / পার হয়েছি হাওয়াই যানে— / পরবাসী তবু জানে / দেশ পেরোনো যায় না । / চিরদিনই সেই অনিমেষ / প্রাণ-রয়েছে গঙ্গাতীরে / চেয়ে থাকি মেঘলা নীচের / ফোটে প্রাণের আয়না / প্রাচীন দেউল শিমূল ছায়া / বুকের ঘাটে বাংলা মায়া / সুধার অতল পায় না / দেশ পেরোনো যায় না ।'

শাশ্বত বাংলার এই লোকায়ত জীবনমাধুরী, পুরুষাণুক্রমিক এই সংস্কৃতি, কবি-মানসকে আবিষ্ট করে রেখেছে । কিন্তু অবিভক্ত বাংলার এই আনন্দন অমরাবতীতে একদিন নেমে এসেছিলো দেশ-বিভাগের দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা । 'স্বাধীন ভারতে ঐক্য ভাঙা / অলীক ধর্মের ঝাণ্ডা উড়েছে । জ্বলেছে আগুন । শিশুঘাতী নারীঘাতী পাশবিকতা নেমেছে বাংলায় বুক জুড়ে । তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে নতুন কালান্তর ।' মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিক প্রাণ-হননের বীভৎসতা পেরিয়ে, পূর্ববঙ্গের মানুষ পেয়েছে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ । সেদিনও কবি 'সুমুদ্রপারের ব্যথা' বুকে নিয়ে বাঙালীর নতুন রাষ্ট্রে পৌঁছে লক্ষ্য করেছেন, 'পৃথিবীর বায়ু আয়ু রঞ্জিত প্রাণের মহাবলে / বাজানো মুক্তির শাঁখ ।'

মহা দুর্যোগের দুঃখসাগর পার হওয়া এই অমরাবতীতেই কবি শুনেছেন মায়ের ডাক — পরবাসী ফিরে এসো ঘরে । কামনা করেছেন : কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল,/ বসুমা, তোমার আঁচল / এখানে বিছাও— / মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উধাও / মেঘে মেঘে চলে নীলাকাশ;/ শেষ করে দূর পরবাস / ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে, / মাটি তুমি নাও বুক মেলে ।"···(৩৯)

বিশ্বপরিব্রাজক কবি বিশ্বকে জেনেছেন 'যৌথ পরিবার' বলে । তাঁর গভীর চেতনায় প্রবাহিত হয়েছে এই নব প্রাণের ধারা । প্রাণের এই বিশ্ব-পরিক্রময়ে কবিমানসে আলো ছায়ার যে বিচিত্র লীলা চলেছে তার আদি উৎস আছে দেশের মাটিতে, সেই উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে সর্বদেশের সঙ্গে এক ময়তা । প্রাণ লোক ও ধ্যানলোকের এই সংগতিই কবিজীবনের মূল প্রত্যয় ।

এই প্রত্যয় কবিকে ডেকে নিয়ে যায় তাঁর স্বদেশের অমরাবতীতে । ১৯৮৬ সালের ১২ ই জুন প্রকাশিত তাঁর রচিত কবিতাসংগ্রহে তিনি বলেছেন — 'মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে-নামেই হোক ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই, ভাষ্য নেই । সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ।''··· (৩১) বসুন্ধরার দেশে দেশে মহাকালে প্রবাহিত যে সর্বাস্তির ধারা প্রবহমান, ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় কবি তাকে পরমসত্য বলে জেনেছেন, এখানেই তাঁর কবিমানসের অন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ।

উৎস নির্দেশ

১।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	' চিঠিপত্র', ২রা এপ্রিল, ১৯৩৪, পৃ -১৮
২।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র' ২রা এপ্রিল, ১৯৩৪, পৃ - ১৯
৩।	অমিয় চক্রবর্তী	'রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি' ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫,
৪।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র' ১১শ খণ্ড, ১৯৩৪, পৃ - ১৫৬
৫।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র' ২রা এপ্রিল, ১৯৩৪, পৃ - ২৫
৬।	অমিয় চক্রবর্তী	'রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি' ২৬শে জুলাই, ১৯৩৯
৭।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'নব যুগের কাব্য' প্রবাসী-চৈত্র, ১৯৪৬,পৃ - ৩৬
৮।	অমিয় চক্রবর্তী	'কবিতা,' কার্তিক, ১৩৪৭, পৃ - ১২
৯।	বুদ্ধদেব বসু	'অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল', কালের পুতুল, ১ম সংস্করণ ১৩৫৩, পৃ - ২৯
১০।	অমিয় চক্রবর্তী	'শিল্পসৃষ্টি,' 'সাম্প্রতিক' ১৯৬৩, পৃ -৩
১১।	অমিয় চক্রবর্তী	'শিল্পসৃষ্টি,' সাম্প্রতিক' ১৯৬৩, পৃ- ৩
১২।	অমিয় চক্রবর্তী	'পরিধি', 'খসড়া' ১৯৩৫, পৃ - ৩১
১৩।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ -২০১
১৪।	বুদ্ধদেব বসু	'অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল', কালের পুতুল, ১ম সংস্করণ ১৩৫৩, পৃ -৩১
১৫।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী,১৯৭৪, পৃ -১৮

১৬।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'রূপনারায়ণের কূলে' শেষ লেখা,১৯৪১, পৃ -২৭
১৭।	আজিজুল হক	'অস্তিত্বচেতনা' 'আমাদের কবিতা' ১৯৮৮, পৃ-৪৪
১৮।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী,১৯৭৪,পৃ - ১৪৩-৪৪
১৯।	বুদ্ধদেব বসু	'অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল', 'কালের পুতুল' ১ম সংস্করণ ১৩৫৩, পৃ- ৩১-৩২
২০।	মাহবুব সাদিক	'আধুনিক কবিতার সমাজ সচেতনতা' ১৯৯১, পৃ - ৬০
২১।	সুমিতা চক্রবর্তী	'কবি অমিয় চক্রবর্তী',২য় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ -২১
২২।	ড. সৈকত আসগর	'বাঙলা কবিতার শিল্পরূপ; চল্লিশের দশক, ১৯৮৬, পৃ - ৭০
২৩।	অশ্রুকুমার সিকদার	'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', পৌষ ১৩৮৬, পৃ -৪৭
২৪।	Lawrence Darel	'Key to Modern Poetry' 1951, p - 11
২৫।	নেপাল মজুমদার	'রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী' বৈশাখ ১৪০৪, এপ্রিল,১৯৯৫, পৃ -২১
২৬।	অমিয় চক্রবর্তী	'বাঙলার দেবমন্দিরে' দূরযাত্রী,১৯৪২, পৃ- ১১
২৭।	অমিয় চক্রবর্তী	'একটি গান শোনা' 'পারাপার' ১৯৪৭, পৃ -১৩
২৮।	অমিয় চক্রবর্তী	'সাম্প্রতিক', ১৯৬৩, পৃ -৪২
২৯।	অমিয় চক্রবর্তী	'ঠেলাগাড়ীর আখ্যান', 'নতুন কবিতা' ১৩৮৭, পৃ- ১২
৩০।	অমিয় চক্রবর্তী	'উজানী,' অনি: শেষ,১৯৫২,পৃ -১৮
৩১।	অমিয় চক্রবর্তী	'কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা' ১৯৫১, পৃ-০১